দাশ

পাবলি

সুকান্ত [illegible]

~~Senior~~

স্বপনবুড়োর নিবেদন

"স্বপনবুড়োর ঝুলি"র পরিকল্পনা করা হয়েছিল বেশ কিছু দিন আগে। শ্রীগুরু লাইব্রেরীর কর্ণধার, বিশিষ্ট সাহিত্য-রসিক শ্রীভুবন মজুমদারের আন্তরিক উৎসাহ ও সহযোগিতায় "ঝুলি" পূজোর ঠিক আগেই রূপলাভ করে প্রকাশিত হল। এই ঝুলির ভেতর দেশের ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু মনের খোরাক পাবে বলে ভরসা রাখি। তেতো, ঝাল, টক, নোন্‌তা, মিষ্টি সব রকম খাদ্যেরই সমাবেশ করবার চেষ্টা করা হয়েছে এতে।

এই সঙ্কলনের কাজে আমি বহু তরুণ বন্ধুর সহযোগিতা লাভ করেছি। ডাঃ অজিতশঙ্কর দের ভাণ্ডারে আমার কয়েকটি হাসির গল্প ছিল। তিনি তার দুটি কাহিনী প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার নিষ্ঠাবান কর্মী শ্রীনৃপেন পাল "স্বপনবুড়োর শুভেচ্ছা" গুলি আন্তরিকতার সঙ্গে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাঁর সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

অনুজ-প্রতিম শিল্পী ধীরেন বল এই ঝুলির 'পরিচায়িকা' ও প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়ে পুস্তকখানির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার নিবেদনে ইতি টেনে দিচ্ছি—

মহালয়া,
ছোটদের পাত্‌তাড়ি, যুগান্তর
১৩৬৩।

বিনীত

স্বপনবুড়ো

5200

স্বপনবুড়োর ঝুলি

অদেখা-বাঁধন

বহুকাল পরে অমিয় পূজোর ছুটিতে দেশে এসেছে। ছেলে বেলায় এইখানকার পাঠশালাতেই প্রথম পাঠ নিয়েছে, তার পর দীর্ঘকাল ছিল কল্‌কাতায় মামার বাড়ি।

এখানকার পথ-ঘাট, গাছ-পালা, পশু-পাখি সকলের সংগেই তার মনের মিতালি। কোন পথটা ক' পা যাবার পর মোড় ঘুরেছে, মাঠের কোন ধারে কী গাছ, খালের ভেতর দিয়ে দিনে ক'খানা ক'রে নৌকো চলে, এ সব অমিয়র মুখস্থ। যে হিজল গাছের ছায়ায় ওদের বিকেল বেলায় বৈঠক বস্‌ত তার ডাল্‌পালায় আজ একটিও পাতা নেই! বুড়ো মানুষের ন্যাড়া মাথার মতোই সে আজ একেবারে রিক্ত। সেখানে আশ্রয় নিলে আজ এতটুকু ছায়া পাওয়া যাবে না!

বিকেল বেলার বৈঠকে যারা মিল্‌ত—তাদের কারো কারো সংগে ইতিমধ্যেই অমিয়র দেখা হয়েছে। পলানে নিজের জাত ব্যবসা ছুতোর-মিস্ত্রির কাজ সুরু করে দিয়েছে। তার বাড়ি গিয়ে হাজির হতে পলানে কী খুশি! কোথায় বসাবে, কেমন করে খাতির করবে—বুঝে উঠতে পারে না—শুধু বোকার মতো ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ করে এদিক-ওদিক তাকায়।

অমিয় তারই মধ্যে ভাঙা টুলটা টেনে নিয়ে বসল ওর কাছাকাছি।

আনন্দের আতিশয্যে পলানে চীৎকার করে বল্লে, মা কে এসেছে দেখ, এসো—

চ্যাঁচামেচি শুনে পলানের মাও বেরিয়ে এলো বাইরে। প্রথমটা অমিয়কে চিন্‌তে পারে নি। কেননা এরই মধ্যে ক্যাঙারুর মতো সে ঢ্যাঙা হয়ে উঠেছে। অচেনা লোক মনে করে মা মাথায় আঁচল তুলে দিতে যাচ্ছিল !

পলানে একগাল হেসে বল্লে, আরে, ওকে চিনতে পারলে না মা ? আমাদের অমিয়। তোমার হাতের বাতাবি লেবু মাখা খেতে খুব ভালোবাস্‌ত ! এইবার পলানের মার মুখে হাসি দেখা গেল। বল্লে, ও ! আমাদের অমিয় ! কত বড়টি হয়ে গেছ বাবা, চিনতেই পারি নি। পলানের সংগে দিনরাত কত আসতে যেতে, যাহোক্ কিছু হাতে তুলে দিতে পারতাম। এখন তো তোমায় মুড়ির মোয়া আর নারকোলের নাড়ু হাত পেতে নিতে বলতে পারবো না।

অমিয় জবাব দিলে, কেন পারবে না মাসি ? আমি যে তোমার হাতের নারকোলের নাড়ু আর বাতাবি লেবু মাখা খেতেই এসেছি।

শুনে পলানের মার আনন্দ ধরে না !

বল্ল, তাহলে তোমরা বোসো বাবা,—আমি একটা বাতাবি লেবু গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে আসি।

পলানের সংগে অমিয় পুরোনো দিনের গল্প স্থরু করে দিলে। ছেলেবেলায় পাঠশালায় যাদের সংগে পড়েছে—তাদের কি কখনো ভোলা যায় ?

সুশান্ত বড় লোকের ছেলে, সে তার কাকার সংগে এলাহাবাদ চলে গেছে; সেইখানকার ইস্কুলেই সে পড়াশুনা করে। সুশান্তর কাকা ওখানে খুব নামকরা উকিল।

বিশ্বাসদের বাড়ির বটুক নদীর ধারে বটগাছ-তলায় একটি পান-বিড়ি আর সোডা-লেমনেডের দোকান দিয়ে বসেছে। মিলিটারী আর কণ্ট্রাক্টারদের কৃপায় আয় তার মন্দ হয় না।

অমিয় বল্লে, একদিন বেড়াতে বেড়াতে নদীর ধারে গিয়েছিলাম। আমায় বলে কিনা, বোস্ অমিয়—বিড়ি খা। বটুকটা দেখলাম ক্রমাগত পান আর বিড়ি ফুঁকছে। অথচ ওই ছিল আমাদের ক্লাসের সব চাইতে মরালিষ্ট।

পলানে বল্লে, আরে ভাই, পয়সার মুখ দেখলে মরাল-টরাল আর কিছু থাকে না। তোর সংগে তবু বরং কথা বলেছে; আমাদের দেখলে ত' চিন্‌তেই পারে না। মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

দেশে ফিরে এসে আর একটি বন্ধুর কথা তার প্রায়ই মনে হয়। তার সঙ্গে ছিল অমিয়র গলায় গলায় ভাব। প্রতি পরীক্ষায় অমিয় হত প্রথম আর সে হত দ্বিতীয়। ইংরাজী ক্লাশের মাষ্টার মশাই রসিকতা ক'রে তাদের দুটির নাম দিয়েছিলেন—Two jewells of the class.

আব্দুলের কথাটা ভাবছিল অমিয়।

কিন্তু মুখ খুলে বল্‌তে সাহস পায় না।

সারাদেশ জুড়ে এমন একটা রেষারেষি আর অমিলের আবহাওয়া বইছে যে, ভালো কথা বলতে গেলেও লোকে তার মানে নিজের মনোমত করে উল্টে-পাল্টে বদ্‌লে নেয়।

অমিয় একবার মনে করলে, আব্দুলের কথাটা সরাসরি পলানেকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয়, এমন জবাব হয়তো সে পাবে যা তার মন কোনোমতেই শুনতে রাজি নয়।

ইতিমধ্যে পলানের মা মুড়ির মোয়া, নারকোলের নাড়ু আর চিঁড়ে ভাজা এনে হাজির। বল্লে, আজ তোমায় বাতাবি লেবু খাওয়াতে পারলাম না বাবা। গাছে যা আছে, একেবারে ছোট ছোট, মুখে তেতো লাগ্‌বে। আছ ত এখন কদিন—আমার মাথার দিব্যি দেয়া রইলো, এসো আর একবার।

নারকোলের নাড়ুর বাটিটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে অমিয় জবাব দিলে, আসব বৈকি মাসিমা! তুমি যে রকম লোভ দেখাচ্ছ, তাতে ত' রোজই আসতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু পলানে নিশ্চয়ই মনে-মনে চট্‌বে যে তার খাবারে ভাগ বসাচ্ছি।

ছেলেবেলার অভ্যেস মতো অমিয়র মাথায় একটি চাঁটি মেরে পলানে বল্লে, যা-যা, মেলা বাজে বকিস নি! ভারী তো খেতে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে আমি আবার চোখ দিতে যাবো। আর তাছাড়া মায়ের হাতের মোয়া ত আমি বারো-মাসই খাই। তোরা কল্‌কাতার সহরে কতরকম খাবার খাস্—আমার মায়ের হাতের মোয়া যে তোর ভালো লাগে এই আমাদের ভাগ্যি—

একটা নাড়ু মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে অমিয় জবাব দিলে, কী যে বকিস তার ঠিক নেই। ওরকম ক'রে বল্লে, মাসির নাড়ুর অপমান করা হয়।

পলানের মা হুটির দিকে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে ওরা বুঝি এখনো পাঠশালার ছোট ছেলেই আছে !

গোবিন্দর সংগেও দেখা হয় অমিয়র।

ছেলেবেলায় গোবিন্দর ছিল মাছ ধরার সখ। বিশেষ ক'রে সে মাছ ধরায় জুড়ি ছিল না গোবিন্দর। ওর পাল্লায় পড়ে অমিয়দের দলকে যে কত এঁদো-পুকুরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে আর মশার কামড় খেয়ে হাত পা ফুলিয়ে ঘরে ফিরতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই !

সেই গোবিন্দও একেবারে বদ্‌লে গেছে।

পাশের গাঁয়ে জমিদারী সেরেস্তায় সে খাতা লেখে। ও যে লেখাপড়া সংক্রান্ত কোনো কাজ করে সেইটে বোঝাবার জন্যে ডান কানে সব সময় একটা ময়ুরের পাখার কলম গুঁজে রাখে। সময় নেই—ভারী ব্যস্ত—এই রকম একটা ভাব গোবিন্দর মুখে-চোখে লেগেই আছে।

সেই গোবিন্দর সংগে গাঁয়ের চার মাথার মোড়ে দেখা। এই বয়সেই গোবিন্দ গলায় একটা চাদর ঝুলিয়ে নিয়েছে।

অমিয় তার চেহারার রকম-সকম দেখে বল্লে, এ কীরে ? গোবিন্দ জবাব দিলে, তোরা বুঝ্‌তে পারবিনে ভাই। জমিদারী সেরেস্তার কাজ,···একটু ভারিক্কী না দেখালে চলে ?

তারপর আপন মনেই কলমটা হাতে ক'রে ঘুরিয়ে নিয়ে কানের পিঠে গুঁজে রাখ্‌লে।

অমিয় ওর ধরণ দেখে হেসে ফেল্লে।

গোবিন্দ চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, হাসলি যে বড় !

তোদের আর কী? সহরে থাকিস্—গায়ে ফু দিয়ে বেড়াস্। আমাদের মোটেই তা নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়, বুঝ্‌লি?

অমিয় মুচকি হেসে বল্লে, সত্যি?

ব্যস্তবাগীশের মতো গোবিন্দ চলে যাচ্ছিল।

অমিয় পেছু ডেকে বল্লে, আয়, বোস না একটু এখানে।

দুজনে নিরিবিলি মখমলের মতো ঘাসের ওপর বসে পড়ল।

অমিয় শুধোলে, হ্যারে গোবিন্দ, এদ্দিন পরে দেশে ফিরে এলাম, আমায় মোটা-মোটা কৈ মাছ খাওয়াবি না?

কৈ মাছের নামে গোবিন্দর চোখ দুটো কল্‌কেয়-বসানো টিকের মতো জ্বলে উঠ্‌ল। বল্লে, ঠিক্ বলেছিস, কালকেই—কি বলিস্?

কিন্তু পর মুহূর্তেই তার সমস্ত উৎসাহ যেন একেবারে নিভে এলো! ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, কি জানিস্, মাছ ধরতে গেলে দাদা বড় বকে। সেই তো আমায় জুলুম করে খাতা লিখতে পাঠিয়ে দিলে। তোরাই বল্‌না—এই কি আমার চাকরি করবার বয়স?

গোবিন্দর ব্যথা কোথায় অমিয় বেশ বুঝ্‌তে পারলে! জবাবে শুধু কইলে, আবার ছেলেবেলাকার দিনে ফিরে গেলে ভারী মজা হয়, নারে?

উৎসাহের সংগে নড়ে-চড়ে বসে গোবিন্দ বল্লে, হ্যাঁরে! এই একঘেয়ে খাতা লেখা আদপেই আমার ভালো লাগে না। আর মাঝে ম্যাঝে নাকের ডগার ওপর চশমা রেখে নায়েব মশাই

আড় চোখে জিজ্ঞেস্ করে, নকল করা কদ্দূর হল? তখন কি মনে হয় জানিস্? কালির দোয়াত শুদ্ধু ছুঁড়ে মারি ওর ছুঁচোলো নাকের ওপর। কিন্তু ভাই সাহস হয় না, মাস গেলে ১৩/১০ করে পাই কিনা! সব দাদার হাতে তুলে দিতে হয়। দু' পয়সার চানাচুর পর্যন্ত খাবার যো নেই। এত কড়া হিসেব দাদার।

গোবিন্দ হয়তো অনর্গল আরো বকে চল্‌ত। কিন্তু হঠাৎ অমিয় জিজ্ঞেস করে বসল, আচ্ছা ভাই গোবিন্দ, আব্দুলের কোনো খবর রাখিস? তার সংগে দেখা-টেখা হয়?

গোবিন্দ চোখ পাকিয়ে জবাব দিলে, খবরদার, ওদের সংগে মিশতে যাসনে আর—অনেক বিপদ। তুই নতুন এসেছিস্ কিনা—খুব সাবধানে চল্‌বি। আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি। মাইনে পেয়েছি কিনা! তাড়াতাড়ি বাড়ি না ফিরলে দাদা আবার বকাবকি সুরু করবে। তোকে যে কিছু খাওয়াবো—

গোবিন্দকে থামিয়ে দিয়ে অমিয় জবাব দিলে, নারে পাগ্‌লা, তোকে কিছু খাওয়াতে হবে না। যদি খেতে হয়ত' তোর বৌদির কাছ থেকে চেয়ে খাবো।

—তবেই খেয়েছিস! ভুরু উল্টে গোবিন্দ বল্লে। আমাকেই দশটা কথা না শুনিয়ে দুবেলা ভাত দেয় না! আর তুই ত' আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু! খবরদার! আমার বাড়ির দিকে কখনো পা বাড়াবি নে!

হেলতে দুলতে গদাই-লস্করী চালে গোবিন্দ নিজের বাড়ির দিকে চলে যায়।

অমিয়র যেন উঠতেই ইচ্ছে করে না। গাঁয়ের চৌমাথার মোড়ে সে চুপ্‌চাপ বসে থাকে।

পশ্চিম আকাশে একরাশ ফাগ ছড়িয়ে দিয়ে সূয্যিমামা পাটে বসেছে। সহরে এ ছবি দেখবার যো নেই। অমিয় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওই দিকে।

আব্দুলের কথাই থেকে থেকে ওর মনে পড়ে। ছেলেবেলায় যার সংগে এত মনের মিতালি হয়, বড় হলে কি সে সব ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়!

দেশের এই অঞ্চলটায় একেবারে থম্‌থমে ভাব। হিন্দু ছেলেরা মুসলমান ছেলেদের সংগে মেশে না—মুসলমানেরাও মেশে না হিন্দুদের সংগে। সেদিন ইস্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় 'বন্দে-মাতরম্' গান নিয়ে তো দুপক্ষে একেবারে রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়ে গেল। এ সব কথা সে পলানের মুখে শুনেছে।

কৈ, ওদের ছেলেবেলায় ত' এমন রেষারেষি, মন-কষাকষি ছিল না! আর মুখ-দেখাদেখিও বন্ধ হয় নি!

অমিয় আর আব্দুলের নাম ইস্কুলের প্রত্যেকটি ছেলের মুখে মুখে ফিরত। পাশাপাশি তারা বসত। একদিন দুদিন নয়—পাঠশালার সারাটা জীবন।

সে যে এতদিন পর দেশে ফিরে এসেছে আব্দুল কি আর সে কথা শোনেনি? ওর মনে কি একবারও একথা জাগছে না যে ছুটে গিয়ে অমিয়র সংগে দেখা করে আসি? অন্যান্য বছর ত' আব্দুলই আগে ছুটে আসে—ধরে নিয়ে যায় ওদের বাড়িতে। আব্দুলের দিদি কত জামরুল খাইয়েছে ওকে! সে কথা কি

কখনো ভোলা যায়? ওদের মোড়ল হয়তো বারণ করে দিয়েছে হিন্দু পাড়ায় আস্‌তে। যেমন নাকি পলানে ও গোবিন্দ ওকে বারণ করল ওর সংগে কথা কইতে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেখানটা একেবারে রক্তাক্ত। ছোটবেলায় সে পাঁঠা কাটা দেখেছে। পশুটার হত্যাকাণ্ডের পর গোটা নাট-মণ্ডপ ঠিক এমনি রক্তে ভেসে যেতো। এই রক্তের নদী আজ আঙিনা ছেড়ে সারা দেশে বয়ে চলেছে। অমিয়র কেবলি মনে হতে লাগল, এই রক্তের নদী সাঁতরে আব্দুলের সংগে ওর দেখা হবে না! ছেলেবেলায় যে মিতালির রাখী ওরা পরস্পরের হাতে বেঁধে দিয়েছিল—শোণিত-বন্যায় তার বাঁধন আল্‌গা হয়ে গেছে।

* * * *

গভীর রাত্রে কিসের একটা কোলাহলে অমিয়র ঘুম ভেঙে গেল।

নদীতে কি বান এসেছে?

মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে একটা প্লাবনের জলোচ্ছাস ক্রমশ তাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আস্‌ছে।

স্বপ্ন না সত্যি ভালো ক'রে বোঝবার আগেই সে পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন ঘুম ভাঙলো, তখন আর অনুমানের অবকাশ নেই, তার ঘরের বেড়ায় আগুন জ্বলছে!

অমিয় লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে দরজার খিল খুলে বাইরে বেরুতে চেষ্টা করল, কিন্তু ওপাশে শিকল তুলে দেওয়া হয়েছে।

এখন উপায় !

বাঁশের শুকনো বেড়ায় আগুন—অতি সহজেই চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। সেই উত্তাপ সহ্য করে অমিয় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ?

ধোঁয়ায় সমস্ত ঘর ভরে গেছে।

সে পাগলের মতো চারিদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলো। দম বন্ধ হয়ে আসছে। কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ায় ভাস্‌তে ভাস্‌তে অমিয় খাটের ওপর একেবারে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল।

এমন সময় পেছন দিক থেকে কে যেন তাকে একটা কাঁথা দিয়ে জড়িয়ে ধরল ; তারপর ভাঙা বেড়ার একটা দিক দিয়ে কৌশলে তাকে বাইরে এনে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখলে।

অমিয়র তখন কথা বল্‌বার মতো অবস্থা নয়। সেই জীবন্মৃত অবস্থাতেও সে বুঝতে পারলে যে, আব্দুল তাকে এই লেলিহান অগ্নিশিখার কবল থেকে রক্ষা করেছে।

অনেক কষ্টে মনের আর বুকের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে চীৎকার ক'রে উঠল, আব্দুল ! তুই !

আব্দুল বল্লে, চুপ ! কথা বলিস্ নে অমিয়। ওরা জান্‌তে পারলে আমাদের ত্বজনের কেউ বাঁচবো না। আমি একটু আগেই খবর পেয়েছিলাম বলে তোকে কোনো রকমে ঘরের বার করে আন্‌তে পেরেছি। এক মিনিট পরে এলে কি কাণ্ড ঘটত—এক মাত্র খোদাই বলতে পারেন।

সেই ঝোপের আড়ালে আব্দুলের বাহু-বন্ধনে থেকে অমিয় দেখতে লাগলো লোকগুলোর পৈশাচিক কাণ্ড।

জিনিসপত্র তচ্‌নচ্‌ করে ঘরের বাইরে এনে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। যা ইচ্ছে দু হাতে লুট করছে—পাগলের মতো লাফাচ্ছে, ঘরে যা খাবার-দাবার ছিল—ফেলে-ছড়িয়ে, লুটে-পুটে নিয়ে খাচ্ছে।

আব্দুল ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বল্লে, ওরা সরে না গেলে তোকে ভাই আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে পারব না! ভাগ্যিস্‌ তোদের বাড়িতে এই সময় আর কেউ ছিল না। দিদি ত' তোর জন্য কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে আছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অমিয় শুধোলে, হ্যাঁ রে আব্দুল, আমি যে দেশে এসেছি সে খবর পেয়েছিলি তুই ?

আব্দুল উৎসাহিত হয়ে জবাব দিলে, সেই দিনই ত' ঘোড়া-ওয়ালার কাছে শুন্‌লাম—যে তোর বিছানা আর বাক্স ব'য়ে নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু আসবার একেবারে যো ছিলো না ভাই! বাইরে থেকে মোল্লার দল এসেছে। তাদের শাসানিতে সবাই একেবারে তটস্থ। তবে এই কথা তুই বিশ্বাস করিস অমিয় যে, গাঁয়ের কেউ তোদের ঘরে আগুন দেয় নি!

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে অমিয় বল্লে, তবে এখন যে তুই বড় ছুটে এলি আমায় আগুন থেকে বাঁচাতে ?

আব্দুল একথার কোনো উত্তর দিলে না, শুধু অমিয়কে দুহাত দিয়ে বুকের কাছে আরো চেপে ধরল।

ঝিঁ-ঝিঁ পোকার একটানা সুরে দুটি কিশোর ঝোপের মধ্যে প্রহর গুন্‌তে লাগল।

ভূত-প্রেতের তাণ্ডব থেমে গেছে।

আব্দুল যখন অমিয়কে নিয়ে তাদের বাড়িতে হাজির হল,—তখন শেষ-রাত্তিরের তারা নিঃসংগ সাক্ষীর মতো একা সারা আকাশটা পাহারা দিচ্ছে।

ভীরু মাটির প্রদীপটা হাওয়ায় কাঁপছে।

তাই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আব্দুলের দিদি—ঠিক গোয়াল ঘরটার সাম্‌নে। ওরা শুধু দুটি ভাই-বোন। সংসারে আর কেউ নেই।

ভাই-বোন মিলে ধরাধরি করে অমিয়কে আব্দুলের ছেঁড়া-কাঁথার বিছানায় শুইয়ে দিলে।

দিদি বল্লে, কোনো ভয় নেই ভাই, আমরা বেঁচে থাকলে তুমিও বাঁচবে। আমার গরু বিইয়েছে, দুধ গরম করেই রেখেছি—ঢক্ ঢক্ ক'রে খানিকটা খেয়ে ফেলো দেখি।

সারারাত দিদি ঠায় অমিয়র শিয়রে বসে। দু' একটি জায়গা সামান্য পুড়ে গিয়েছিল, দিদি কি সব টোট্‌কা ওষুধ লাগিয়ে দিতেই জ্বলুনি একেবারে থেমে গেল। পাড়াগাঁয়ের টোট্‌কা ওষুধ সময়ে-সময়ে অদ্ভুত কাজ দেয় কিন্তু অনেক নাম করা ডাক্তার তার সন্ধান রাখে না।

শেষ রাত্তিরে পাখার হাওয়ায় অমিয় নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভাই-বোনে দুবার এসে উঁকি মেরে দেখে গেল, কিন্তু কেউ ওর ঘুম ভাঙালো না।

সারাদিন গেল, সন্ধ্যে উৎরে গেল—অমিয়কে কি কাল-ঘুমে পেয়েছে কে জানে!

রাত যতই বাড়তে লাগল দুই ভাই বোনের মুখে ততই আশংকার ছায়া ফুটে উঠতে লাগলো।

আরো খানিকক্ষণ বাদে আব্দুল এসে বল্লে, এইমাত্র আমি গোফুর ভাইয়ের কাছে জানতে পারলাম—অমিয়ভাই যে আমাদের ঘরে আছে, তা ওরা কি ক'রে খোঁজ পেয়েছে। আজ রাত্রেই নাকি ওকে সবাই খতম করে ফেল্‌তে চায়!

শিউরে উঠল দিদি! বল্লে, বলিস কি! আমাদের প্রাণ দিয়েও অমিয় ভাইকে বাঁচাতে হবে।

আব্দুল বল্লে, কিন্তু দেহে আর মনে ও এমন একটা চোট পেয়েছে যে নির্জীবের মতো পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। কি করে ওকে তুলি বল তো?

দিদি বল্লে, না-না—আমাদের মন শক্ত করতে হবে ভাই! ওকে তুল্‌তেই হবে—

হঠাৎ বাইরের দিকে কয়েকটা লোকের গোলমাল শোনা গেল।

দিদি বল্লে, আমি ওদের গিয়ে আটকাচ্ছি, তুই সব দিক রক্ষা কর—আব্দুল!

আর কথা বল্‌বার ফুরসৎ হল না—দিদি দ্রুত পায়ে সেই দিকে চলে গেল।

একটা লোক এগিয়ে এসে বল্লে, তোমাদের বাড়িতে একটি ছেলেকে লুকিয়ে রেখেছো—ভালো চাও ত' বের করে দাও।

দিদি মনে মনে খোদার নাম স্মরণ করলে,—তারপর বল্লে,—আমাদের ঘরে ? কেউ নেই তো ! তোমরা বোধ করি ভুল খবর পেয়েছে।

ওদিকে আব্দুল অমিয়কে ঘুম থেকে তুলে পেছন দিককার দরজা খুলে বাড়ির বাইরে চলে এসেছে। বাড়ির বাইরেই খাল। সেখানে আব্দুলের ডিঙি-নৌকো বাঁধা।

দুজনে চুপ্‌চাপ গিয়ে নৌকোতে উঠ্‌ল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। দড়ি বাঁধা ছিল একটা গাছের ডালের সংগে। সে বাঁধন খুলে দিলে।

স্রোতের টানে নৌকো এগিয়ে চল্লো। আব্দুল বল্লে, আমি আজ আর কোনো কথা ভাবিনে ভাই ! তোর প্রাণটা আগে বাঁচাতে হবে। তোকে আগে গাঙের ঘাটে পৌঁছে দিয়ে আমার অন্য কাজ। বুঝ্‌লি, মানুষগুলি একেবারে ক্ষেপে গেছে। নিজেদের ভালো-মন্দ বুঝতে চায় না। সুবিধেবাদীদের উস্কানিতে এই কাণ্ড। আচ্ছা তুই বল, লুটের মালে কেউ বড়লোক হতে পারে ? এক কথায় বাংলা দেশটাকে ওরা ফাঁক করে দিলে।

কী লাভ হবে ? যারা শোষণ করবার তারা চিরকালই গরীবের অন্ন মারবে। আমি তোকে বলে রাখছি অমিয় ভাই, এ ভাগাভাগি বেশি দিন চল্‌বে না। এই বাংলা দেশ তার ভাষা তার সাহিত্য তার বিজ্ঞান তার ধ্যানের ধন, একি ভাগাভাগি

করে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা চলে মুড়ির মোয়ার মত ? তা হলে আমরা এদ্দিন পাশাপাশি বসে কি লেখাপড়া শিখলাম ?

আবার আমরা মিলবো—পাশাপাশি—হাত-ধরাধরি ক'রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো—

অমিয়র মাথায় যেন ঝড় ব'য়ে যাচ্ছিল।

সে কোনো কথার জবাব দিলে না। অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখলে, চাঁদের আলোতে আব্দুলের চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করছে !

"শিশুরে বঞ্চিত করা জীবনের গুরু অপরাধ"

—চুপ—চুপ—চুপ্‌!

—কেউ টু শব্দটি করোনো!

—কেন কি হয়েছে?

—বিদেশী বুঝি? এখনো শোননি?

—কি এমন বুক-ভাঙা, হাড়-কাঁপা খবর শুনি?

—রাজার সাজ্ঘাতিক ব্যায়রাম! যাকে বলে রাজযক্ষ্মা; শিবের অসাধ্য ব্যাধি।

—কেন, রাজবৈদ্যি কি ঘুমুচ্ছে? 'নিদান' খুলে ভালো ভালো ওষুধ দিতে পারে না? রাজকোষ খোলা আছে, যত খুশি টাকা নিক্‌…বনের গাছ-গাছড়া তুলে অনেক ভালো-ভালো ওষুধ তৈরী হোক্‌। রাজা বেঁচে উঠ্‌বেন।

—তবে ব্যাপারটা খুলেই বলি শোনো। রাজার হয়েছে রাজযক্ষ্মা। রাজবৈদ্যি এলেন। হাত দেখলেন, নাড়ী টিপলেন, চোখের কোণ টেনে দেখলেন, বুকের ধড়ফড়ানি পরীক্ষা করলেন, পায়ের পাতা থেকে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত তন্ন-তন্ন করে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা দিলেন যে, গরুর দুধ হচ্ছে একমাত্র ওষুধ, জলপান বারণ, শুধু গো-দুগ্ধে বেঁচে থাকতে হবে।

—বেশ ত। রাজার গোশালায় কি দুগ্ধবতী গাভীর কোনো

আছে ? তিনি গরুর দুধে স্নান করুন, গরুর দুধ পান করুন, দুধে আচান—যা খুশি।

—তবে আর গেরোর কথা বলো কেন ? রাজার পেটে দুধ সয়না, এক ঝিনুক খাইয়ে দিলে, দশ ঝিনুক বমি হয়ে পড়ে। রাণী কাঁদছেন, রাজকন্যা উপোস করে মন্দিরে পূজো দিয়েছেন, রাজপুত্র নিজের বুকের রক্ত দিয়ে মন্দিরের দেবীর পা ধুইয়ে দিয়েছেন, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না ! তাইত রাজ্যে আমোদ-প্রমোদ, ভোজ, বলি, সভা-সমিতি, কবিতা-পাঠ, চিত্র-অঙ্কন সব বন্ধ। কেউ টু শব্দটি করতে পারবে না—সেনাপতির শক্ত আদেশ !

সত্যি তাই !

যে পুরীতে অতি সকাল থেকে নহবৎ বাজ্‌তো, বন্দীরা বন্দনা গাইত, দুপুরবেলা রাজকুমারী নৃত্যশিক্ষা করতেন, সন্ধ্যায় কবিতার শ্লোকে রাজসভা মুখরিত হয়ে উঠত, মন্দিরে বাজত শত কাঁসর ঘণ্টা, গভীর রজনীতে শোনা যেত সেতারের মিঠে বাজনা···সব কিছু একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে ! মনে হচ্ছে একটা অদেখা মাকড়সা যেন গোটা রাজপুরীর ওপর তার মায়াজাল বিছিয়ে দিয়েছে। তাই সঙ্গীত মূর্চ্ছিত, ভাষা নির্ব্বাক, সাহিত্য স্তব্ধ আর মন্দিরের মন্ত্র ম্রিয়মান !

মন্ত্রি তার সাদা দীর্ঘ দাড়িতে হাত বুলিয়ে বল্লেন; রাজ কবিরাজের ভরসায় আর মহারাজের চিকিৎসা ফেলে রাখতে পারিনে। লোক পাঠাবো ম্লেচ্ছ দেশে, যবন দেশে, সাগর পারে, হিমালয়ের নিভৃত-গুহায়। যে রাজার প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে পারবে তাঁকে দেবতা জ্ঞানে আমরা পূজো করবো, রাজকোষ খুলে তাঁকে

পুরস্কার দেবো, তাঁর স্বর্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করবো !

দলে দলে ঘোষক, মন্ত্রির এই ঘোষণা ঢ্যাড়া দিয়ে ফিরতে লাগলো—দেশে, বিদেশে, সাগর পারে, বনের অন্ধকারে, পাহাড়ে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে, গিরি গহ্বরে, পাতালে, গগন-পথে –

বহু চিকিৎসক এসে রাজপুরীতে সমবেত হ'ল। তাদের সঙ্গে ওষুধ এলো ঘোড়ার পিঠে, উটের পিঠে, গাধার পিঠে, হাতীর পিঠে জাহাজে, নৌকোয় আর বিমানে। নানা দেশের ঔষধ রাখবার জন্য এক বিরাট চিকিৎসা-ভবন নির্ম্মান করা হ'ল। সেই ওযুধের উগ্রগন্ধে দেশের কাক, চিল, পোকা, মাকড় সব গেল মরে, জন্তু জানোয়ার পালিয়ে গেল দেশ ছেড়ে।

সাগরপারের চিকিৎসক বল্লেন, রাজাকে এক উঁচু-পাহাড়ের ওপর শুইয়ে রাখতে হবে। রোদ, বৃষ্টি সব তাঁর গায়ের ওপর দিয়ে যাবে, তবেই তিনি একেবারে ভালো হয়ে উঠবেন।

ম্লেচ্ছ দেশের চিকিৎসক বল্লেন, বন্য কুক্কুটের ক্বাথ তৈরী করে ছ'মাস খাওয়াতে হবে, তবে যদি রাজা ভালো হন ! পাতালপুরীর চিকিৎসক বল্লেন, রাজাকে একলক্ষ সূচিকা-ভরণ করতে হবে, তবে যদি জীবনের আশা ফিরে আসে। গগন-পারের চিকিৎসক বিধান দিলেন যে, তাঁদের দেশের পুষ্পক-রথে চড়ে রাজাকে মেঘলোকে অবস্থান করতে হবে। তারই ফলে রাজা রোগমুক্ত হবেন।

যবন দেশের চিকিৎসক বল্লেন, একশত ছাগলের সঙ্গে রাজাকে একবছর একই গৃহে বাস করতে হবে, তবে রাজার গলার রক্ত পড়া বন্ধ হবে।

মন্ত্রির আদেশে ঘটা করে চিকিৎসা সুরু হ'ল। এক দেশের চিকিৎসা শেষ হয় ত' আর এক দেশের প্রথা সুরু হয়।

ফলে রাজার জীবনী-শক্তি যা-ও একটু ছিল, ধীরে ধীরে সেটাও কমে আস্‌তে লাগলো!

রাণীর রোদনে রাজপুরীর সোপান পিছল হয়ে উঠল, রাজকুমারীর দীর্ঘশ্বাসে রাজ্যের বাতাস ভারী হয়ে গেল, রাজকুমারের অস্থিরতায় সকলের চোখ থেকে ঘুম গেল পালিয়ে!

মন্ত্রি বিচলিত হয়ে উঠ্‌লেন। সেনাপতি তরবারী মুষ্টি বদ্ধ করে অকারণ বিনিদ্র রজনী যাপন করতে লাগলেন। কোটালের অমনোযোগিতার সুযোগ নিয়ে দেশে চুরি-ডাকাতি বেড়ে গেল। হঠাৎ একদিন শেষ রাত্রে মন্ত্রির ঘুম ভেঙে গেল। হিমালয়ের নিভৃত গুহায় যে দূত পাঠানো হয়েছিল সেখান থেকে ত' সে ফিরে আসেনি। সকাল বেলা রাজপুরীতে এসে মন্ত্রি দ্রুত অশ্বারোহী পাঠিয়ে দিলেন হিমালয়ের নিভৃত গুহার উদ্দেশ্যে।

দূত আর অশ্বারোহী হতাশ হয়ে ফিরে এলো। হিমালয়ের গুহার তপস্বী এ-রাজ্যে আসতে রাজি হননি। তিনি বলেছেন, রাজ্যে পাপ ঢুকেছে, তাই তিনি এ-রাজ্যে পদার্পণ করবেন না।

মন্ত্রি কাউকে কিছু না জানিয়ে ছদ্মবেশে একদিন হিমালয়ের নিভৃত গুহার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এই রাজাকে তিনি নিজে হাতে মানুষ করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন, আর পাশে বসে রাজ্য পরিচালনা করেছেন। সেই পুত্রের অধিক রাজা……তাকে কি তিলে-তিলি মৃত্যুর পথে তিনি যেতে দেখতে পারেন?

মন্ত্রির মুখে সব কথা শুনে হিমালয়ের তপস্বী বল্লেন, আমি

তোমাদের রাজ্যে যেতে পারি, কিন্তু আমার পা ছুঁয়ে শপথ করতে হবে যে, আমার আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবে।

মন্ত্রি তপস্বীর পাদ-স্পর্শ করে অঙ্গীকার করলেন। হিমালয়ের অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে এলেন ন্যাসী—উজ্জ্বল সূর্য্যালোকের মাঝখানে।

মন্ত্রি বললেন, আপনার জন্যে রাজরথ হিমালয়ের সানুদেশে অপেক্ষা করছে, আপনি চলুন।

তপস্বী মৃদুহেসে জবাব দিলেন, আমাকে পদব্রজে যেতে হবে। আর তোমায় যেতে হবে আমার সঙ্গে—এই কমণ্ডলুতে আছে গঙ্গাজল তাই বহন করে নিয়ে। রাজার জীবন রক্ষার জন্যে মন্ত্রি সমস্ত কষ্ট সহ্য করতেই প্রস্তুত। কোনো আপত্তি না করে, সারথিকে বিদায় দিয়ে দু'জনে অগ্রসর হলেন। একপক্ষ কাল রাত্রি-দিন হেঁটে তাঁরা দুজনে রাজপুরীতে এসে উপস্থিত হলেন।

তপস্বী বল্লেন, রাজাকে নিয়ে এক গোপন কক্ষে তাঁর চিকিৎসা আরম্ভ হবে ; শুধু মন্ত্রি সঙ্গে থাকতে পারবে।

গোটা রাজ্যে থম্‌থমে ভাব। কখন কি হয় কেউ বলতে পারে না। এর আগে সমস্ত চিকিৎসাই ব্যর্থ হয়েছে, তাই চিকিৎসার ওপর মহারাণীর আর কোনো বিশ্বাস নেই।

মনে হচ্ছে, সমগ্র রাজ্য বিপদের শেষ দিনগুলি নীরবে গণনা করে চলেছে। কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারে না, পাছে সত্যিকথা তাদের চোখে-মুখে ধরা পড়ে।

এমনি হতাশার মধ্যে সুরু হ'ল হিমালয়ের তপস্বীর চিকিৎসা। রাজপুরীর এক গোপন ঘর। সেখানে শয্যাগত রাজা, মন্ত্রি আর

তপস্বী। তপস্বী উদাত্ত কণ্ঠে কি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন সেই মন্ত্রের ধ্বনি কক্ষের দেয়ালে প্রতিহত হয়ে রাজার কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে লাগলো।

রাজা সম্মোহিত হয়ে পড়লেন। তারপর তপস্বী মন্ত্রির হাতের কমণ্ডলু থেকে পবিত্র গঙ্গাজল নিয়ে রাজার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিলেন।

রাজা উদ্‌ভ্রান্তের মতো চোখ মেলে তাকালেন। তপস্বী গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লেন, রাজা, আজ থেকে বিশ বছর আগের কাহিনী স্মরণ করো।

রাজার ঠোঁটটি শুধু নড়ে উঠল। কিন্তু তিনি কোনো কথা বলতে পারলেন না।

তপস্বী বল্লেন, রাজা মন স্থির করো, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও—

ক্ষীণকণ্ঠে রাজা উত্তর করলেন, বিশ বছর আগের কোনো কথা আমার মনে পড়ছে না।

তপস্বী আবার মন্ত্র উচ্চারণ করে শুধোলেন, এইবার অতীতের পানে তাকাও দেখি রাজা—

চীৎকার করে উঠলেন রাজা, শুধু অন্ধকার।

তপস্বী বল্লেন, ওই অন্ধকারে আলো ফুটবে। তার ভেতর তুমি তোমার অতীতের পাপের চিত্র দেখতে পাবে রাজা!

রাজা এইবার শিউরে উঠলেন ঃ অভিভূতের মতো বলতে লাগলেন—হ্যাঁ তপস্বী, আমি চিত্রের ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ......আজ থেকে বিশ বছর আগে ঘোড়ায় চড়ে অসংখ্য সৈন্য নিয়ে

আমি এই দেশ আক্রমণ করলাম। গ্রামের পর গ্রাম বিধ্বস্ত করে চললাম। আমার বিজয় পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারলে না। হঠাৎ একি ! একটি পাতার কুটীরের সামনে আমার ঘোড়া থমকে দাঁড়ালো।

তপস্বীর মুখ এইবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ব্যাকুল হয়ে শুধোলেন, হ্যাঁ পাতার কুটীর। সেই পাতার কুটিরে তুমি কি দেখতে পাছ রাজা ?

—দেখতে পাচ্ছি, দুখিনী মা তার একমাত্র ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে। তার শেষ সম্বল বিক্রী করে খানিকটা গরুর দুধ জোগাড় করেছে। অনুনয় করে সেই শিশুর মা বলছে, একটু অপেক্ষা করো রাজা, আমি আমার দুধের বাছাকে দুধ খাইয়ে নি ! দু'দিন বাছা কিছু খায়নি। তার পর এই পাতার কুটীর আমি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। না হয় তুমি এই বনটা ঘুরে চলে যাও, তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না রাজা।

তপস্বী জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তুমি কি করলে রাজা ? রাজা উন্মাদের মতো চীৎকার করে উঠলেন, আমি ? আমি মায়ের সে কথায় কান দিলাম না। রাজ্য-জয়ের নেশা আমায় তখন পেয়ে বসেছে। দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম সেই পাতার কুটীরের ভেতর দিয়ে। ঘোড়ার খুরে দুধের পাত্র দূরে ছিট্‌কে পড়ল—শিশুটি পায়ের চাপে বরণ করে নিল অকাল মৃত্যুকে— ! আমি দেখতে পাচ্ছি—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ! রক্তে রাঙা হয়ে গেল সেই পাতার কুটীর—তার ওপর দিয়ে আমার তেজী-ঘোড়া পথ করে নিয়ে রাজ্য-জয়ের নেশায় এগিয়ে চল্লো।—

তপস্বী তখন বল্লেন, রাজা, তাহলে তুমি বুঝতে পারছ, কি গুরু অপরাধ তুমি করেছ ? কোলের শিশুকে মা দুধপান করাতে যাচ্ছে, সেই দুধ ফেলে দিয়েছ ! শুধু তাই নয়, তোমার ঘোড়ার খুরে শিশুর মৃত্যু হয়েছে ! শিশুর রক্তপাত ও জীবন নাশ করেছ বলে তোমার হয়েছে রাজযক্ষ্মা ! আর শিশুকে দুধ থেকে বঞ্চিত করেছ বলে কিছুতেই তুমি দুধ পান করতে পারছো না।

রাজা হাত জোড় করে বল্লেন, তপস্বী, আপনি আমাকে এই অভিশাপের হাত থেকে রক্ষা করুন, আমি আপনাকে রাজ্যখণ্ড পুরস্কার দেবো। এইবার উন্মাদের মতো হেসে উঠলেন তপস্বী, তুমি বাতুল রাজা ! আমায় তুমি রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছ ! তুমি জানো, কত রাজার মুকুট আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে··· আমি সেদিকে চেয়েও দেখি না। তাইত হিমালয়ের নিভৃত-গুহায় শুধু ভগবানের নাম সম্বল করে বেঁচে আছি। তোমার মন্ত্রি পুণ্যাত্মা লোক, শুধু তার অনুরোধেই আমি গুহা ছেড়ে তোমার এই পাপ পুরীতে প্রবেশ করেছি। কিন্তু বেশীদিন আমি এখানে থাকতে পারবো না, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

মন্ত্রি তখন তপস্বীর পায়ের ধূলো নিয়ে অনুনয় করে বল্লেন, হে সন্ন্যাসী, আপনি যখন দয়া করে আমার সঙ্গে এসেছেন, তখন রাজাকে শাপ-মুক্ত না করে কিছুতেই যেতে পারবেন না। আমি আপনার পা জড়িয়ে বসে থাকবো।

সন্ন্যাসীর ললাটে চিন্তারেখা দেখা গেল। খানিকক্ষণ তিনি কোনো কথাই বল্লেন না। দুটি মুখ করুণ ভাবে তার দিকে তাকিয়ে জীবন-মৃত্যুর দোলায় দুল্‌ছে।

তপস্বী ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বল্লেন, শোনো রাজা, তোমাকে এই রাজ্যের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে হবে—"শিশুরে বঞ্চিত করা জীবনের গুরু অপরাধ।" একদিন নয়, দু'দিন নয় ক্রমাগত একমাস ধরে এই ঘোষণা তোমাকে করতে হবে। যদি কোনো প্রজা এসে তোমার অতীত জীবনের কথা শুনতে চায়, তবে সকলের সামনে সে কথা বলতে হবে।

ক্ষীণকণ্ঠে রাজা বল্লেন, কিন্তু সন্ন্যাসী, আমি রুগ্ন, শয্যাগত, চৌমাথার মোড়ে আমি যাবো কি করে? সন্ন্যাসী জবাব দিলেন, নিজের মনোবলই তোমায় সেখানে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করবে। মনে-মনে এই প্রতিজ্ঞা করো যে, আপন পাপের কাহিনী তুমি সবাইকে জানিয়ে ভগবানের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে চাও। পায়ে জোর পাবে—হেঁটে চলে যেতে পারবে চৌমাথা অবধি, আর, গলায় পাবে জোর—এই কথা সকলের সামনে ঘোষণা করবার। আরো একটি কথা—

—আজ্ঞা করুন।

সন্ন্যাসী বল্লেন, শিশুকে তুমি দুধ খেতে দাওনি, তারই ফলে তোমার পেটে দুধ থাকছে না! তুমি আরো ঘোষণা করে দাও রাজা, যে, তোমার রাজ্যে প্রত্যেক শিশুকে দুধপানের ব্যবস্থা রাজকোষ থেকে করে দেবে। হাতজোড় করে রাজা বল্লেন, আমি নিশ্চয়ই সে ঘোষণা করবো সন্ন্যাসী।

খবর কানে-কানে পৌঁছুলো রাণীর কাছে। রাণী আপত্তি করে বল্লেন, বিছানার সঙ্গে মিশে আছেন রাজা, চৌমাথার মোড়ে

যাবেন কি করে? রাজকন্যা বল্লেন, আমি বাবার হয়ে সন্ন্যাসীর কাছে ক্ষমা চাইছি, প্রায়শ্চিত্ত করছি—

রাজকুমার বল্লেন, পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত' ছেলেই করতে পারে, একই রক্ত বইছে আমার ধমনীতে। কিন্তু তপস্বী নিশ্চল···পাথর, তার কথার নড়চড় কিছুতেই হবে না। মন্ত্রি বল্লেন, আমরা রাজাকে ফিরে পেতে চাই···কাজেই তপস্বীর কথা অক্ষরে অক্ষরে রাজাকে পালন করতে হবে। রোগ যেমন গুরুতর, তার চিকিৎসাও ত' তেমনি সাঙ্ঘাতিক হবে!

সন্ন্যাসীর কথায় রাজা উঠে দাঁড়ালেন। যে বিছানা থেকে তিনি ক'বছর উঠতে পারেন না, সেই শয্যাত্যাগ করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাজপুরীর সোপান বেয়ে তিনি এগিয়ে চল্লেন।

রাজকন্যা ছুটে এলেন পাদুকা নিয়ে—রাজপুত্র এগিয়ে এলেন রাজছত্র নিয়ে, অঙ্গুলি সঙ্কেতে তপস্বী তাদের থামিয়ে দিলেন। বল্লেন, খালি পায়ে খোলা মাথায় রাজাকে অগ্রসর হতে হবে। রাজা এগিয়ে চলেন—কিসের শক্তিতে কে জানে!

প্রজারা শুনে অবাক হয়ে পথের দু'ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের কারুর মুখে টু শব্দ নেই—সবাই নির্ব্বাক।

কেউ-কেউ আবার মারমুখো হয়ে বল্লে, আমাদের রাজাকে কষ্ট দিচ্ছে যে সন্ন্যাসী তাকে আমরা মেরে ফেলবো; সইবো না তার অন্যায় জুলুম।

হাত তুলে মন্ত্রি তাদের থামিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে রাজা এসে দাঁড়ালেন চৌমাথার মোড়ে। অবাক কাণ্ড!

যে রাজার কথা বলতে অসুবিধা হ'ত—তিনি চীৎকার করে

ঘোষণা করলেন,—"শিশুরে বঞ্চিত করা জীবনের গুরু অপরাধ।" তারপর নিজের পাপের কাহিণী সবাইকে শুনিয়ে দিলেন। আরো ঘোষণা করলেন যে, তার রাজ্যে সব শিশু প্রত্যহ রাজ-ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় দুধ পাবে।

এইভাবে রাজা একমাস ধরে ঘোষণা করে চললেন। রাজ্যে আবার পাখীর দল ফিরে এলো—ফিরে এলো পশুরা। দুগ্ধবতী গাভীতে রাজার গোশালা ভরে গেল। কামধেনুর মতো তারা রাজ্যের শিশুদের দুধ বিতরণ করতে লাগলো।

স্বাস্থ্যবান শিশুর দল ফোটা ফুলের মতো গোটা রাজ্যকে উদ্যানে পরিণত করল।

যেখানে রাজা বিশ বছর আগে পাতার কুটীর ভেঙে ফেলে-ছিলেন, সেইখানে তাঁর আদেশে দেশের নামকরা শিল্পী নির্ম্মাণ করলেন মা ও শিশুর মর্ম্মর মূর্ত্তি। মা শিশুকে দুধপান করাচ্ছে। সেই মূর্ত্তি দেখে কেউ আর চোখ ফেরাতে পারে না—এমন মন-ভোলানো প্রাণ-জুড়োনো সে মর্ম্মরমূর্ত্তি!

তারি তলায় রাজার আদেশে বড়-বড় অক্ষরে খোদাই করা হ'ল—

"শিশুরে বঞ্চিত করা জীবনের গুরু অপরাধ!"

মূর্ত্তিকে কেন্দ্র করে নির্ম্মিত হ'লো এক সুন্দর উদ্যান। সেই উদ্যানে দেশের ছেলেমেয়েরা মনের আনন্দে খেলা করতে লাগলো। দেশের রাজা পূর্ণ-স্বাস্থ্য লাভ করলেন, কিন্তু সেই তপস্বীকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না!

পরাজয়

সন্তুর ঠাকুর্দা পূর্ববঙ্গের ডাক সাইটে জমিদার। এবার তিনি কলকাতায় এসেছেন পূজোর সওদা করতে। জিনিস-পত্তর তো আর কম কিন্‌তে হয় না! কেননা—গোটা গাঁ-খানার লোক তাঁরই প্রজা; পূজোর সময় সকলকে তিনি নতুন কাপড়-চাদর বিতরণ করে থাকেন। গ্রামের সমস্ত লোক এই তিনটি দিনের আশায় হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে।

জমিদারবাবু এবার নিজে এসেছেন, তাই কিন্‌তে কিন্‌তে জিনিস-পত্তর পর্বত-প্রমাণ হয়ে উঠল।

ঠাকুর্দা বল্লেন, ওই ভীড়ের মধ্যে ট্রেনে আমি কিছুতেই যেতে পারবো না; তার চাইতে দুটো বড়ো নৌকো ভাড়া করা হোক। একটায় যাবে জিনিস-পত্তর, আর একটায় যাবো আমি। একেবারে বাড়ির খিড়কির দোরে গিয়ে নামতে পারবো।

সন্তু বল্লে, আমি কখনো দেশের পূজো দেখিনি, আমি তোমার সঙ্গে যাবো ঠাকুর্দা! সন্তুর বাবা হাইকোর্টের বড় ব্যারিস্টার; দেশ-গাঁয়ে যাবার বিশেষ পক্ষপাতী তিনি নন। ছুটিতে হামেশাই তিনি পশ্চিমে হাওয়া খেতে যান।

কিন্তু সন্তু যখন ঠাকুর্দাকে পেয়ে বসল, তিনি আর আপত্তি করতে পারলেন না। কাজেই সন্তুর দেশে যাওয়াই স্থির হোলো।

নৌকো যখন গিয়ে পদ্মায় পড়ল তখন সন্তুর খাঁচায়-থাকা-মন যেন ডানা মেলে লক্ষ লক্ষ পাখির মত শরতের হালকা মেঘের সংগে উড়ে যেতে চাইলে। নদীর তীর ঘেঁসে কাশফুলের মেলা বসেছে। সন্তুর ইচ্ছে হল, হাওয়ায় মেতে ঐ কাশফুলের সংগে লুকোচুরি খেলে, দূরের ঐ বাড়িখানির ধারে শিউলী গাছের তলায় বসে ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথে—তারপর সেই মালা দুলিয়ে দেয় ঐ উড়ন্ত বলাকাদলের গলায়। সন্তুর মনে হল, পাল তোলা নৌকো, নদীর কল-কল্লোল, বাঁশ-বনে বাতাসের খিলখিলে হাসি···শরতের সোনালী রোদ—এই সকলের সংগে তার মনের আসন পাতা আছে। কলকাতার ইঁটপাথরের পুরীর ও কেউ নয়—বরঞ্চ সে এদেরই একজন।

এক জায়গায় জেলের দল বসে মাছ ধরছিল। রূপোলী ইলিশ মাছে জাল একেবারে ছেয়ে গেছে। ঠাকুর্দা বল্লেন, গরম ভাতের সংগে এই টাটকা ইলিশ মাছের ঝোল। কি বল সন্তু? আর আমার সংগে দেশের খাঁটি গাওয়া ঘী ত রয়েছে।

অতি সাধারণ ভাবে রান্না করা ইলিশমাছের ঝোলের যে এমন স্বাদ হতে পারে সন্তু কোনোদিন তা ধারণাও করতে পারে নি। নদীর ওপরে ওর ক্ষিদেও দ্বিগুণ বেড়ে গেল নাকি?

সন্তুর দিনগুলো সকাল-সন্ধ্যের রঙীন মেঘের মতোই বড় বিচিত্র গতিতে কাট্‌তে লাগ্‌লো।

সেদিন বিকেলের মুখে নৌকো নদীর পাড় ঘেঁসে চলেছিলো। ঠাকুর্দার সংগে সন্তু ছাদের ওপর চেয়ার ফেলে বসেছিল।

হঠাৎ দেখা গেল, একটা লোক নদীর ধার দিয়ে ছুটতে ছুটতে

আসছে আর প্রাণপণে হাতের ইশারায় নৌকোটাকে থামাতে বলছে!

ঠাকুর্দা আরামে গড়গড়া টানছিলেন—একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বল্লেন, লোকটা কী বলছে রে?

মাঝিরা নৌকোর গতি একটু মন্থর করলে। লোকটা ছুটতে ছুটতে এসে প্রায় নৌকোর কাছাকাছি পৌঁছুল। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লে, বাবু দয়া করে আমায় তুলে নাও—ওই হোথায় যখন বাঁক ঘুরবে আমি নেমে যাবো।

ঠাকুর্দা ছাদের ওপর থেকে বল্লেন, কেন, খেয়া নৌকোয় পার হয়ে যা না—

লোকটি সংগে সংগে ছুটতে ছুটতে মুখ কাঁচুমাচু করে বল্লে, খেয়া নৌকো বন্ধ হয়ে গেছে বাবু; তবু আমি তোমাদের কষ্ট দিতুম না বাবু—কিন্তু আমার মেয়েটির বড্ড অসুখ—ঐ গাঁয়ের হাসপাতালে গিয়েছিলুম ওযুধ আনতে—আমায় পার করে দাও বাবু—নইলে মেয়েটা বোধ করি আজ রাত্তিরেই—

লোকটা তার কথা শেষ করতে পারলে না। কিন্তু তখনো নৌকোর সংগে ছুটতে লাগলো। মাঝিরা ঠাকুর্দার মুখের দিকে তাকালো।

ঠাকুর্দা জিজ্ঞেস করলেন, এ জায়গাটার নাম কী রে?

লোকটা জবাব দিল, খুনীর চর।

ঠাকুর্দা যেন আঁৎকে উঠলেন। তারপর লোকটা যেন শুনতে না পায়, এই ভাবে মাঝি-মাল্লাদের উদ্দেশ করে বল্লেন, সাবধান! এখানে নৌকো ভিড়েস নে; এখানে ডাকাতের বড্ড ভয়।

লোকটার যে রকম ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারা দেখছি—ও ডাকাতের দলের লোক না হয়ে যায় না। ছল করে আমাদের মন গলিয়ে নৌকোয় উঠে নিশ্চয়ই ফ্যাসাদে ফেলবার মতলব। নৌকো মাঝ নদীর দিকে ছেড়ে দে—

ঠাকুর্দার আদেশ পেয়ে মাঝির দল বদর বদর বলে হাল ঘুরিয়ে দিলে। প্রকাণ্ড একটা ফাঁড়া কাটলো মনে করে ঠাকুর্দা গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টান্‌তে লাগলেন।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ডাকাতটা আমাদের নৌকোয় এলে কী হতো? ঠাকুর্দা বল্লেন, আমাদের মেরে-কেটে সব জিনিস-পত্তর টাকা-কড়ি নিয়ে পালিয়ে যেতো; আশে-পাশেই ওদের দলের লোক আছে নিশ্চয়। ওই ব্যাটাই সঙ্কেত করে তাদের ডাক্‌ত।

ঠাকুর্দার কথা শুনে ভয়ে সন্তু ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। তার চাইতে ট্রেনে যাওয়া ছিল অনেক ভালো।

হঠাৎ পাড়ের কাছে ঝপাং ক'রে কিসের একটা শব্দ হতেই সবাই আঁৎকে উঠ্‌ল! মাঝিরা বল্লে, সেই লোকটা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরাচ্ছে।

ঠাকুর্দা ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, ডাকাত! ডাকাত! তোরা তাড়াতাড়ি আরো একটা পাল খাটিয়ে নৌকো জোরে ছেড়ে দে—

সন্তু ভয়ে ঠাকুর্দাকে জড়িয়ে ধরলে, ঠাকুর্দা চোখ বুঁজে ক্রমাগত দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। পালে বাতাস পাওয়াতে নৌকো তড়িৎ গতিতে এগিয়ে চললো।

সন্ধ্যের মুখে হঠাৎ নদীর চেহারা গেল বদলে। ঈশান কোন্ থেকে কে যেন অতি দ্রুতবেগে এক ছোপ কালি মাখিয়ে

দিচ্ছে আকাশের গায়। দেখতে দেখতে সেই কালি গোটা আকাশটা ছেয়ে ফেল্লে। আকাশের ছায়া নদীর বুকে পড়তে নদীর জলও গাঢ় কালো কালিতে রূপান্তরিত হলো।

মাঝিরা সামাল সামাল রব করে পাল নামিয়ে নেবার আগেই নদীর বুকের যা কিছু সুন্দর তাই অশুভ পায়ে দলে ছুটে এল আশ্বিনের উন্মত্ত ঝড়।

ঝড়ের ঝাপটাটা এলো সামনে থেকে তাই যে পথ দিয়ে নৌকো এসেছিলো সেই পথেই আবার তাকে ঠেলে নিয়ে চল্লো একখান মোচার খোলার মতো।

হঠাৎ নৌকোটা একটা মোচড় খেয়ে তীব্র গতিতে তীরে গিয়ে ধাক্কা দিলে। সংগে সংগে ঠাকুর্দার বাহুবন্ধন থেকে খসে সন্তু একেবারে নদীর জলে ছিট্‌কে পড়ল। তাল সামলাতে না পেরে ঠাকুর্দা পড়লেন গিয়ে ডাঙ্গায়। নিমেষের মধ্যে এমন ভাবে এই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেল যে, ঠাকুর্দা ভালো ক'রে বুঝতেই পারলেন না কী তাঁর হারালো। ঠিক ঐ পাড়ের ওপরেই একটা মাঝি-বাড়ি।

ঝড়ের গোঙানিকে ছাপিয়ে নৌকোর ধাক্কা লাগার শব্দ তাদের কানে গিয়ে পৌঁছেছিল। শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো এক বৃদ্ধ। হাতের মৃদু লণ্ঠন ঝড়ের ঝাপটায় নিভে গেল। কিন্তু নদীর পাড়ের আঁধারের সংগে বৃদ্ধের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। মূর্ছিত ঠাকুর্দাকে চিনে নিতে তাঁর বেশি বেগ পেতে হলো না। ঐ খানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ডাকতেই আর একটি বলিষ্ঠ যুবক ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঠাকুর্দাকে পাঁজা কোলে তুলে ভেতরে নিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ বাদে জমিদারবাবু জ্ঞান হলে তাকিয়ে দেখলেন, তিনি যাকে সেদিন বিকেলে পার করেন নি—সেই বলিষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ লোকটি ঝুঁকে পড়ে এক দৃষ্টে তাঁকে দেখছে।

প্রথমটা ঝড়ের কথা তাঁর মনেই হলনা—ডাকাতের হাতে পড়েছেন ভেবে তাঁর বুকটা দুরু দুরু কাঁপতে লাগলো।

কিন্তু সে এক মুহূর্ত মাত্র…তার পরেই তাঁর স্মৃতিশক্তি ফিরে এলো।

—সন্তু-সন্তু—আমার সন্তু—সে যে নদীর জলে ভেসে গেছে!

বুড়ো মাঝির ছেলে সেই বলিষ্ঠ কালো লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ও! আমি বুঝতে পেরেছি বাবু! যে ছেলেটিকে ছাদের ওপর তোমার সংগে দেখেছিলাম—তারই কথা বলছ বুঝি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ! বৃদ্ধ জমিদার আঁকুপাঁকু করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন—সে আমার নাতি—ওর বাপের কাছ থেকে আমিই ওকে ছিনিয়ে এনেছিলাম—এখন আর আমার যে মুখ দেখাবার যো রইলো না।

কালো লোকটি জমিদারবাবুকে জোর করে শুইয়ে দিয়ে বল্লে, তুমি কিচ্ছু ভেবোনা বাবু—আমি আমার ডিঙি নিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ছি…দেখি তোমার নাতিকে ফিরিয়ে আনতে পারি কিনা।

বুড়ো মাঝি মাথা নেড়ে বল্লে,—সেই ভালো, দেখ্ যদি ভদ্র-লোকের উপকার করতে পারিস…হয়তো তাহলে দিদিমনিরও ব্যামো ভালো হয়ে যাবে।

মাঝির ছেলে যখন বৈঠে নিয়ে রওনা হল তখন বৃষ্টি থেমে

গিয়েছে, কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ার গোঙানি সমভাবেই চলেছে পাগলা নদীর বুকের ওপর দিয়ে।

মাঝির ছেলের ডিঙিখানা নাচতে নাচতে নদীর কালো জলের সংগে দূরে মিলিয়ে গেল—সেই দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ জমিদারের দুই চোখ জলে ভরে এলো!

ক্রমে ভাঙা মেঘের ফাঁক দিয়ে দু-এক টুকরো চাঁদের আলো উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলো। ঘনকৃষ্ণ আকাশের বুকে তারার দলও জেগে উঠলো···কিন্তু বাতাসের গোঙানির আর বিরাম নেই। আর নেই সেই বৃদ্ধ জমিদারের চোখে ঘুম। জমিদারবাবু এক একবার দারুণ হতাশায় বিছানার ওপর শুয়ে পড়েন, তারপর কী একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ছুটে বাইরে বেরিয়ে যান্। উন্মত্ত নদী তখনো ফেনা নাচিয়ে—কূল ছাপিয়ে ছুটে চলেছে। তার সেই ক্ষুধিত গ্রাস থেকে যে সন্তু ফিরে আসবে একথা কোনো ক্রমেই জমিদার ভাবতে পারেন না। শুধু দুই চোখ আকাশের দিকে তুলে ধরেন; সেখানে কানাকানি করে তারার দল কি বলে···পৃথিবীতে বসে বৃদ্ধ তা শুনতে পারেন না।

মাঝি-বাড়ির ভেতর এই সময় আর একটি বুড়োর চোখেও ঘুম নেই! নাতনীর শিয়রে বসে বুড়ো মাঝি কেবলি চোখের জল ফেলছে···আর ভগবানকে ডেকে বলছে···আমার ছেলে যেন ওর নাতিকে ফিরিয়ে আনতে পারে—তবেই আমার দিদিমণি ভালো হয়ে উঠবে।

শেষ রাত্তিরের দিকে বাতাসের বেগ একটু কমতে জমিদারের চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল। হঠাৎ নদীর কিনারায় নৌকো

লাগাবার খস্ করে একটা শব্দ হতেই বুড়োর তন্দ্রা ছুটে গেল।

জমিদারবাবু ছুটে বাইরে এলেন। পাণ্ডুর চন্দ্রালোকে দেখা গেল—মাঝির ছেলে কাকে যেন বুকে চেপে ধরে ডিঙি থেকে নামছে। এই দৃশ্য দেখে জমিদারের বাক রুদ্ধ হয়ে গেল।

রাক্ষসী নদী—! সেই তাকে ফিরিয়ে দিলি—তবু তার প্রাণটা ফিরিয়ে দিলি না কেন?

বৃদ্ধ টল্‌তে টল্‌তে সেই নদীর ধারেই পড়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মাঝির ছেলে এক হাতে তাঁকে ধরে ফেলে বল্লে, তুমি ডর পেয়োনা বাবু, ভগবান তোমার নাতিকে বাঁচিয়েছে। ঝড়ে নদীর কিনারে একটা গাছ ভেঙ্গে পড়েছিল—তারি সংগে ওর জামা আট্‌কে যায়! আমি গিয়ে দেখি—একটা ডালের সংগে ছেলেটা ঝুলছে। ভয়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়েছে বাবু, মুখে চোখে জল দিয়ে বাতাস করলেই উঠে পড়বে। ভগবান ওকে রক্ষা করেছেন বাবু—

শ্রান্ত, ক্লান্ত মাঝির ছেলে অচৈতন্য সন্তুকে জমিদারের কোলে তুলে দিতেই বাড়ির মধ্যে বুড়ো মাঝির বুক-ফাটা চীৎকার শোনা গেল—দিদিরে দিদি—

মাঝির ছেলে পাগলের মতো ভেতরে ছুটে গেল!

বৃদ্ধ জমিদার সন্তুকে কোলে নিয়ে সেইখানে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। নদীর ওপারে পূব আকাশকে রক্ত রাঙা করে তখন সূর্য উঠছে! বৃদ্ধ সেই দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আপন মনে যেন কাকে প্রশ্ন করলেন, আমাকে এমন করে তুমি মাটির সংগে

মিশিয়ে দিলে কেন—দয়াময়? ওদের কোল শূন্য না করে কি তুমি আমার কোল ভরে দিতে পারতে না? এই কি তোমার বিচার?

রাত্রির অন্ধকারে আর মুখ লুকোবারও যো রইল না; তরুণ-তপন তখন নিষ্ঠুর ভাগ্য-বিধাতার মতোই আকাশকে অগ্নিময় করে তুল্লে!

ডাকুর ডিঙি

ওকে সবাই জলচর বলে সন্দেহ করে।

পূর্ব্ব-বঙ্গের এক পাড়াগাঁয়ে তার বাড়ী। ডাকু বল্লে চেনেনা এমন লোক সে তল্লাটে মেলা ভার। ডাকুর সাথের সাথী তার ডিঙিটি। খাল থেকে নদীতে হামেশাই যাতায়াত করে। বাড়ীতে থাকবার মধ্যে এক পিসিমা। পুঁটি মাছের মত ফর্ ফর্ করে ডাকু তার ডিঙি চালিয়ে যায়, এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী, এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া। এমন কায়দায় সে ছোট্ট বৈঠা টানে তাতে ডিঙির তলাটা জল ছোঁয়-কি-ছোঁয় না।

শত কাজ নিয়ে ডাকু তার ডিঙির সাথে যুক্ত থাকে। ওর জন্ম থেকে যদি ঘড়ি-ঘণ্টা নিয়ে হিসেব করা যায় তো দেখা যাবে ওর জীবন ডাঙার থেকে জলেই বেশী কেটেছে।

পিসিমা সব সময় মুখ ঝাম্টা দিয়ে বলে, নেই কাজ তো খই ভাজ! এত করে বলি, দু-দণ্ড বাড়ীতে মন স্থির করে বোস! তা' ডিঙির গলুই ছাড়া হতভাগার বসবার জায়গা নেই! জমিতে দুটো বেগুন, কুমড়ো, শশা লাগালে সংসারে আয় দেয়। কিন্তু সেদিকে নজর নেই!

পিসিমার অভিযোগ কিন্তু মিথ্যা নয়। পাড়াপ্রতিবেশীদের সাত-সতেরো কাজ নিয়ে ডাকু সব সময়েই যেন ঘোড়ায় চড়েই আছে।

তবে ডাকুর ঘোড়া জমিন দিয়ে যায় না, জল দিয়ে ছোটে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে এক-কোঁচড় মুড়ি নিয়ে ডিঙিতে চাপ্‌ল।

পিসিমা পিছু ডেকে বল্লে, ওরে, একেবারে দুপুর গড়িয়ে দিস্‌নে যেন! তোর জন্যে ফ্যানাভাত রান্না করবো, ডালের বড়ি সেদ্ধ দিয়ে, তুই খেতে বড্ড ভালবাসিস। সতু গয়লার কাছ থেকে একটু গাওয়া ঘি চেয়ে রেখেছি। গরম ভাতে খেতে দিব্যি হবে।

ডাকু জবাব দিল, সে জন্যে তুমি কিছু ভেব না পিসিমা, ঘণ্টার ছোট ভাইটা বড় ব্যায়রামে পড়েছে। ঘণ্টার মা আমায় খুব ধরেছে, তাকে নিয়ে একটু সরকারী ডাক্তারখানায় যেতে হবে। আমি যাব আর আস্‌বো।

এর পর পিসিমা যে কি কথা বল্লে, সেকথা ডাকুর কানে গেল না,…কারণ এরই মধ্যে তার ডিঙি খালের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

মোড় ঘুরতেই দেখা পরাণ-সাধুর সঙ্গে। বুড়ো খালের ধারে বসে আপন মনে ধুঁক্‌ছে। হাতে একটা খালৈ। বাজারে যাবে এমনি একটা নৌকোর প্রত্যাশায়ই বসে আছে। ডাকুকে ডিঙির ওপর দেখে বুড়ো যেন হাতের মুঠোয় আকাশের চাঁদ খুঁজে পেলো। সরু হাড় বের করা হাতটা উঁচু করে ধরে বল্লে, ও বাবা ডাকু, কাল রাত্তির থেকে জ্বরে বড় ধুক্‌ছি। ছোট মেয়েটাও জ্বর থেকে আজ অন্ন-পথ্য কর্‌বে। এই খালৈটা নিয়ে যা বাবা—আর কিছু না পাস্‌, দুটি পুঁটি মাছ অন্তত এনে দিস্‌…একটু আঁশটে গন্ধ না হলে মেয়েটা দু-মুঠো ভাত মুখে দিতে পারবে না।

ডাকু মৃদু আপত্তি করে বল্লে, কিন্তু খুড়ো, আমায় যে ঘণ্টার ছোট

ভাইটিকে নিয়ে এক্ষুণি একবার সরকারী ডাক্তারখানায় যেতে হবে।

পরাণ সাধু মরিয়া হয়ে জবাব দিলে, ঐত আর দু-পা গিয়েই রথ খোলার বাজার। তোকে 'ব্যাগ্যাতা' করে বলছি। খালৈটা নিয়ে যা। এক টুক্‌রো মাছ না পেলে মেয়েটা বড় কান্নাকাটি করবে। সাতদিন পরে আজ ভাত খাচ্ছে কিনা। হয় তো কেঁদে-কেটে আবার জ্বরই ডেকে আন্‌বে।

নিরুপায়ের সুরে ডাকু বল্লে, আচ্ছা খুড়ো, তুমি যখন এতো করে বল্‌ছ, দাও খালৈটা। কিন্তু খালৈ নিয়ে খালের ধারে বৈঠার খোঁচা দিতেই ডাকুর মনে পড়ে গেল যে পরাণ সাধুর কাছ থেকে মাছের দাম নেয়া হয়নি। পেছন ফিরে বল্লে, ও খুড়ো, মাছ আন্‌তে খালৈ দিলে, পয়সা কই?

পাছে পয়সা নিতে সে আবার ফিরে আসে এই ভয়ে সাধু তাড়াতাড়ি বল্লে, শুভ-কাজে যাচ্ছিস্ আর পেছু ফিরিস্ নে ডাকু, মাছটা নিয়ে আসিস্,—আমি ডান-হাতে বাঁহাতে পয়সা গুঁজে দেবো'খন।

ডাকু বুঝতে পারলে খুড়োর ডান-বাঁ হাতের যোগাযোগ কোনো কালেই হবেনা—কাছেই মাছের পয়সা পাবার আশাও বিশেষ নেই।

তবু সে মুখের উপর কাউকে 'না' বল্‌তে পারে না। সকলের অনুরোধ দিন-রাত তাকে বয়ে বেড়াতে হয়। সাধে কি আর পিসিমা বলে, "নেই কাজ তো খৈ ভাজ।"

এই ভাবেই তাকে এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী অকারণে খৈ ভেজে বেড়াতে হয়।

অবশ্যি এজন্যে গাঁয়ের সবাই তাকে ভালবাসে, ডাকু বল্‌তে গায়ের ছেলে-বুড়ো-ঝি সবাই অজ্ঞান। সকলের বোঝা বয়ে হাসি কুড়িয়ে বেড়ানোতে যে কি মধুরতা, ডাকুই ভাল বলতে পারে।

"কপালকুণ্ডলা' বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমারকে উপলক্ষ্য করে এই রকমই কি একটা কথা যেন বলেছেন। যার কাঠ কাটা স্বভাব —পরের জন্যে কাঠ না কেটে সে থাক্‌তে পারে না।

এমনি চুল-বুলে স্বভাব আমাদের ডাকুর।

ডাকুর নৌকো এগিয়ে চলেছে—ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে বাঁশ-বন ছাড়িয়ে, নন্দীদের ইটের পাঁজার পাশ দিয়ে—হঠাৎ ডাক এলো পাশের বাড়ীর পুকুর ঘাট থেকে। মিনুদি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে।

ডাকু গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে, কি মিনুদি, কিছু বল্‌বে? মিনুদি তবু কথা বলে না, হাতছানি দিয়ে ঘাটের পাশে আস্‌তে ইসারা করে দিলে।

ডাকুর ডিঙি সকলের কাছে সমান আজ্ঞাবহ। এগিয়ে এলো বাড়ীর খিড়কীর ঘাটে।

ডাকু ভয়ে শুধোলে, কি হয়েছে মিনুদি ?

মিনুদি আঁচলে চোখ দুটো একবার মুছে নিয়ে বল্লে, তোর ভগ্নি-পতির বড় অসুখ রে ডাকু। যমে-মানুষে টানাটানি। কিন্তু এরা আমাকে চিঠি লিখ্‌তে দেবেনা। সেই তত্ত্ব পাঠানো নিয়ে কি কথা কাটাকাটি হয়েছিল তাই, মনুদি আর কিছু গুছিয়ে বল্‌তে পারেনা—তার দু-চোখ জলে ভরে ওঠে। শুধু আঁচলের তলা থেকে লুকোনো একটা চিঠি বের করে দেয়।

ডাকু বল্লে, কিছু তোমায় বলতে হবেনা মিনুদি, আমি বুঝে নিয়েছি, চিঠিটা ডাক-বাক্সে ফেলে দিতে হবে তো? মিনুদি ঘাড় নাড়তেই শিশির বিন্দুর মত আর দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

লোকের চোখের জল ডাকু সইতে পারে না। তর্-তর্ করে এগিয়ে চলে ডিঙি ঘণ্টাদের বাড়ীর দিকে।

কিন্তু সোজা পথে যাবার যো ডাকুর নেই। ওর জন্যে ঘাটে ঘাটে কাজের বোঝা জমা হয়ে আছে। বিশ্বঠাকুর বুড়ো শিবতলা থেকে ডেকে বল্লেন, ও বাবা ডাকু, আমায় একটু পার করে দে না' —সেন বাড়ী গিয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। সময় বয়ে গেলে সব পণ্ড।

ডাকুর ডিঙি বাঁয়ে ঘুরে যায়।

এমনি করে কাজের বোঝা চুকিয়ে যখন সে গিয়ে ঘণ্টাদের বাড়ী হাজির হল—অনেকটা বেলা হয়ে গেছে তখন।

ঘণ্টার মা রোগা ছেলেকে নিয়ে আকুল নয়নে পথ চেয়ে ছিলেন। তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে বল্লেন, এই যে বাবা ডাকু, সকাল থেকে তোর পথ চেয়ে বসে আছি। ছেলেটার অসুখ আরো বাড়া-বাড়ি হয়েছে বাবা।

ডাকু একটু লজ্জিত হয়ে জবাব দিলে, তুমি কিছু ভেবোনা মাসিমা। হাসপাতালে ওকে দেখিয়ে একটু বাদেই আমি ফিরে আস্ছি। তুমি ওকে বার্লি খাইয়ে দাও, ফির্তে একটু বেলা হবে তো? পরাণ খুড়োর মেয়ের জন্যে আবার বাজার থেকে একটু মাছ কিনে নিয়ে আস্তে হবে। সে আজ অন্ন-পথ্যি করবে কিনা।

ঘণ্টার মা কপালে একটা চড় মেরে বল্লেন, আ আমার কপাল! বার্লি কোথায় পাব শুনি? একটু ফ্যান খাইয়ে দিয়েছি।

ডাকু আঁত্‌কে উঠে বল্লে, অ্যাঁ, করেছ কি মাসিমা! এতদিনের জ্বোরো রুগীকে তুমি ফ্যান খাইয়ে দিলে?

দেবো না তো কি কর্‌বো শুনি? ছেলেটা যে ক্ষিদের জ্বালায় সেই রাত্তির থেকে কান্না জুড়ে' দিয়েছিল।

মুখ ঘুরিয়ে মাসিমা চোখের জল মোছেন। তারপর কথাটা চাপা দেবার জন্যেই যেন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আর দেরী করিস্ নে বাবা ডাকু! ডাক্তার হয় তো সরকারী হাসপাতালের দরজা বন্ধ করে দিয়েই চলে যাবে।

ডাকুর ঐ এক দুর্ব্বলতা, কারো চোখের জল সইতে পারেনা। ডিঙির দিকে পা চালিয়ে জবাব দিলে—হ্যাঁ, তুমি ওকে কোলে করে নিয়ে এসে ডিঙিতে চাপিয়ে দাও। দুর্গা-দুর্গা বলে রওনা হয়ে পড়ি আমরা—

একটা বেড়াল পুষলেও তার ওপর মানুষের মায়া হয়। ডিঙির ওপর ডাকুর মায়া তার চাইতে আরো বেশী।

সে ওর গায়ে হাত বুলোয়—আপন-মনে তার সঙ্গে কথা কয়।

সর্ সর্ করে ধান-ক্ষেতকে চুলে চিরুণির মতো দু-ভাগে চিরে দিয়ে ডিঙি যখন এগিয়ে চলে ডাকু চোখ বুজে ভাবে ডিঙি তার সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইতে চাইছে। চারপাশে তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও আছে কিনা।

একটা মাছ-রাঙা পাখী উড়ে পালায়। ডিঙি কথা বল্‌তে লজ্জা পায় কিনা কে জানে !

ডিঙির সঙ্গে ডাকুর মনের মিতালি।

পাশের জঙ্গল থেকে সে নিজে গাব পেড়ে নিয়ে আসে। সেই গাবের রস সে সযত্নে ডিঙিতে লাগায়।

একবার একটা জোড়া একটু ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। গাব লাগিয়ে দিতে দু-বছর আর কোনো গোলমাল হয়নি। নৌকোর একটু এদিক-ওদিক হলে সে বুঝতে পারে। মা যেমন ছোট ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে গালে গাল লাগিয়ে দেহের উত্তাপ নেয়, তেমনি ডাকু তার ডিঙিতে হাত বুলিয়ে তার কুশল প্রশ্ন করে। শেয়ালের যেমন ল্যাজ, কাকাতুয়ার যেমন ঝুটি, সিংহের যেমন কেশর আর কর্ণের যেমন কবচ-কুণ্ডল—ডাকুর তেমন ডিঙি। একটাকে বাদ দিয়ে গাঁয়ের কেউ আর একটার কথা ভাবতে পারে না।

ডাকুর মাছ ধরারও ভারী সখ। ডিঙির ওপর ছোট্ট ছিপ, গেঁথে মাছ মারবার জন্যে কোচ, খ্যাপলা জাল, এই সব নিয়ে সে প্রায়ই বিকেলের দিকে ধান-ক্ষেতের ভেতর ঢোকে। ওর অধ্যবসায় আর নিষ্ঠায় আমদানী নেহাৎ কম হয় না। সেই মাছগুলিই কি সে বাড়ী নিয়ে আসে ? নিজে তো একটা মানুষ। কার বাড়ীতে কে অন্ন পথ্যি কর্‌বে, কে পয়সার অভাবে ছেলে-মেয়ের মুখে একটুকরো মাছ তুলে দিতে পারে না—তাদের হদিশ ডাকুর নখাগ্রে। সবাইকে বিলিয়ে একটা বড় পুঁটি কিংবা দুটি পাবতা নিয়ে বাড়ী ফিরে পিশিমার গাল খেয়ে বোকার মত সে হাস্‌তে থাকে।

সেই হাসির মধ্যে যে আত্ম-তৃপ্তি লুকিয়ে থাকে কেউ হয়ত তার সন্ধান রাখেনা।

ডাকুর নিজের কাছে তার দাম লাখ টাকা।

*   *   *

হঠাৎ একটা কালো-মেঘের ছায়ায় এই অঞ্চলের সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

যুদ্ধের খবর এতদিন ছিল বহুদূরে আর কাগজের পাতায়। কিন্তু জাপানীরা নাকি এগিয়ে আসছে বাংলা দেশের দিকে।

সরকারের হুকুম, সব ডিঙি নৌকো বাজেয়াপ্ত করা হবে। নইলে জাপানীরা এসে এই সব ডিঙি নৌকো দখল করে নদী-নালা পার হয়ে নাকি গোটা বাংলা দেশটাই তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নেবে।

ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তবে ভয়ের কথা সন্দেহ নেই।

ডাকু প্রথমে কথাটা কানে তোলেনি।

এই তো তার এক ফোঁটা ডিঙি—মোচার খোলার মত ভেসে বেড়ায়। সেদিকেও কি সরকারের দৃষ্টি পড়বে?

হঠাৎ খবর এলো, সেই অঞ্চলের সমস্ত জেলে-ডিঙি সরকার দখল করে নিয়েছে।

যারা মাছ ধরে আর মাছ বিক্রী করে খায়, তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

কিন্তু মহাসমরের বৃহত্তর প্রয়োজনে চোখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে গেল।

ডাকু কদিন থেকেই ভয়ে ভয়ে ছিল। কিন্তু সেখানেও পালে বাঘ পড়ল।

ডাকুর ছোট্ট ডিঙি সরকারের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারল না! থানা থেকে লোক এসে ডিঙি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেল। খালটা যেখানে নদীর মুখে পড়েছে ডান দিকের শুক্‌নো বালির চড়ায় সমস্ত ডিঙি উপুড় করে ফেলে রাখা হয়েছে। কড়া রদ্দুরে নৌকোর তলাগুলি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। ডাকু একদিন লুকিয়ে দেখে এসেছে।

যে নৌকোর তলা জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে কত কথা কানাকানি করতে করতে খিড়কীর পুকুর থেকে খালের বাঁকে—আবার খালের বাঁক থেকে মাঝ দরিয়ায় সাঁতার কেটে বেড়াত তার বোধকরি সকল কথা জন্মের মত বন্ধ হয়ে গেছে। কাঠ ফাটা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ডাকুর মনে হল—ডিঙিটার আকণ্ঠ তেষ্টা পেয়েছে।

এই ছোট ডিঙিই এতদিন কত রোগীর কত ঔষধ জুগিয়েছে, কত পথিককে পার করে দিয়েছে, কত চিঠি ডাকঘরে ফেলেছে, কত ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন জুগিয়েছে—সংবাদ বহন করে কত জনকে দিয়েছে তৃপ্তি। আজ কেউ তাকে ডেকেও জিজ্ঞেস করেনা।

ডিঙি নেই, তাই গোটা গাঁয়ে ডাকুর দাম আজ একটা কানা-কড়িও নয়।

নাইবা থাক্‌লো দাম।

কিন্তু ডিঙিটা যে প্রচণ্ড রৌদ্রে হাঁফাচ্ছে। সারা জীবন ধরে এত বোঝা বইল, কণ্ঠটা রুদ্ধ হয়ে যাবার আগে কেউ কি তার কাছে এক ঘটি জলও এগিয়ে দেবেনা?

আত্মার মুক্তি

প্রাচীনকালে এক অত্যাচারী রাজা ছিল।

কারো মধ্যে কোন ভাল গুণ দেখলে সে রাজা রাত্তিরে ঘুমুতে পারত না, দুঃস্বপ্ন দেখে কেবলি চম্‌কে চম্‌কে উঠত।

ভাই যদি ভাইকে ভালবাসত, বাবা ছেলেকে যদি স্নেহ করত, মা যদি নিজের সন্তানকে কোলে করে খাওয়াত, তবে এই অত্যাচারী আর হিংসুটে রাজার মনে আগুন জ্বল্‌তে থাকত।

মানুষের আত্মা আর বিবেককে সে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে চাইত।

তার রাজ্যে সবাই মিথ্যেবাদী হোক, লোককে হিংসে করুক, খুন-জখম করুক, ঈশ্বরকে না মানুক···আর সব সময় রাজার বশ্যতা স্বীকার করুক—এই ছিল সেই অত্যাচারী রাজার কামনা।

রাজার আদেশে শয়তান গুপ্তচরেরা ছদ্মবেশে সারা দেশময় ঘুরে বেড়াত।

যদি তারা দেখত, ভায়ে ভায়ে মিলেমিশে এক সঙ্গে বাস করছে···অমনি তাদের মাথার টনক নড়ত! তারা টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিত। পরে দেখা যেত, যে-ভাইরা একে অন্যকে না দেখে থাক্‌তে পারত না—তারাই লোভে আর হিংসায় একজন আর একজনের টুঁটি টিপে ধরেছে!

যদি শয়তান গুপ্তচরেরা কোথাও দেখত যে, ছেলেরা মা-বাবার কথা মেনে চল্‌ছে, সবাই শিক্ষা লাভ করছে···সংসারে রয়েছে

শান্তি তখুনি তারা ফুস্‌-ফুস্‌ করে ছেলেদের কানে কি মন্তর দিত।

তারই ফলে দেখা যেত ছোটরা আর বড়দের সম্মান দিচ্ছে না, উদ্ধতভাবে কথা বলছে। বড়রা ছোটদের যে শিক্ষা দিতে চাইছে, ছোটরা তা কানে নিচ্ছে না! সবাই বলছে, আমিই বড়, অন্যের কথা আমি শুনব কেন? এইভাবে ঝগড়া মারামারি আর অশান্তির সৃষ্টি হতে থাকল।

মন্দবুদ্ধি গুপ্তচরের দল—দেশের ছেলেদের শেখাতে লাগল—বুড়ো মা-বাপকে আর খেতে দিতে হবে না। ওদের ধরে নিয়ে পিঁজরে পোলে গরু-ছাগলের মত আট্‌কে রাখলেই হবে। দেশের রাজা ওদের দানা-পানির ব্যবস্থা ক'রবে। তোমরা শুধু রাজাকে কাঁড়ি-কাঁড়ি খাজনা জুগিয়ে যাও।

এই রাজ্যে কয়েকজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা লোকালয় ত্যাগ ক'রে পর্বতের গুহায় নির্জনে বসে ধ্যান-ধারণা করছিলেন!

তাঁরা দেখতে পেলেন দেশ ক্রমশ রসাতলের দিকে যাচ্ছে। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা সবকিছু মানুষের অন্তর থেকে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। মানুষ জন্তু-জানোয়ারের মত হিংস্র হয়ে পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরছে। মানুষের আত্মা অসহ্য ব্যথায় গুমরে কাঁদছে। বোধকরি মানুষের মন আস্তে আস্তে পাথর হয়ে যাবে।

সেই জ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন একজন সর্বকালজ্ঞ ঋষি। তিনি যোগবলে মানুষের আত্মাকে একটি পাখীতে রূপান্তরিত ক'রে নিজেদের গুহায় লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু সেই পাখী এমন করুণ

সুরে গান গাইতে লাগল যে, সেই দুষ্ট রাজার আর রাত্তিরে ঘুম আসে না!

অস্থির হয়ে উঠল সেই হিংসুটে রাজা। তখন সে গুপ্তচরদের আদেশ দিল, যে ক'রে হোক—এই পাখীকে তোমরা ধরে নিয়ে এস—নইলে আমি ঘুমুতে পারছি না। ওই পাখীর কান্নায় আমি দুই চোখের পাতা এক করতে পারছি না।

দলে দলে চারদিকে ছুটল সেই গুপ্তচরের দল। একজন সন্ধান পেল—পাহাড়ের ওপরে এক সন্নাসীর গুহায় সেই পাখীটি গান গাইছে।

গভীর রাত্রে চুপি চুপি পাহাড়ের পথ বেয়ে সেই শয়তান পাখীটিকে চুরি করবার জন্য অগ্রসর হ'ল।

সর্বকালজ্ঞ ঋষি সে কথা ধ্যানযোগে জানতে পেরে পাখীটিকে একটি ছবিতে রূপান্তরিত করে পাহাড়ের গুহার গায় এঁকে রাখলেন।

শয়তানটা এসে দেখে—পাখী কোথায়ও নেই, কিন্তু সেই করুণ সুরের গান একটি ছবি থেকে বেরিয়ে আসছে।

শয়তান গুপ্তচরটা সেই আজব কথা রাজাকে গিয়ে জানাল।

রাজা তখন না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছেন। চীৎকার করে আদেশ দিলেন, একদল মিস্ত্রিকে নিয়ে যাও—তারা গুহার সেই অংশটা কেটে পাখীটাকে বন্দী ক'রে নিয়ে আসবে রাজপ্রাসাদে।

রাজার আদেশ তো আর অমান্য করা চলে না!

যেখানে পাখীর ছবিটা আঁকা ছিল—মিস্ত্রিরা পাথরের একটা বিরাট অংশ শাবল দিয়ে ভেঙে নিয়ে চলে এল।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে, গভীর রাত্রে সেই পাখীটা মূর্তি ধরে করুণ সুরে গান গায়। তাতে রাজা কিছুতেই ঘুমুতে পারেন না! চোখ একেবারে জবা ফুলের মত লাল হয়ে গেল, ভীষণ মাথার যন্ত্রণা…রাজা একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়লেন।

রাজার আদেশে পাখীটাকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করা হ'ল। রাজার অনুচরের দল যত ঘসুক না কেন—সেই পাখীর ছবি পাথর থেকে কিছুতেই ওঠে না!

শাবল দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করা হ'ল কিন্তু পাথরও ভাঙে না।

রাজা আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিছানা ছেড়ে ওঠবার তার ক্ষমতা নেই।

রোজ রাত্তিরে সেই পাখীর গান শুনে রাজ্যের লোক বুঝতে পারল তারা কোন্ ভুল পথে চলেছে।

সবাই তখন সজ্ঘবদ্ধ হ'ল।

ঠিক ক'রল, একদিন রাজপুরী আক্রমণ ক'রে সেই পাথরশুদ্ধ পাখীটাকে সবাই মিলে ছিনিয়ে আনবে।

কিন্তু রাজার সৈন্যেরা অস্ত্রবলে সকল লোককে হটিয়ে দিল।

দেশ জুড়ে কান্নার রোল উঠল।

মানুষ-মানুষকে বিশ্বাস ক'রতে চায় না।

তখন সেই ত্রিকালজ্ঞ ঋষি দেখ্লেন যে, দেশ নরকে পরিণত হতে চলেছে!

তখন তিনি উদাত্ত-কণ্ঠে এক মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগ্‌লেন। ধীরে ধীরে পাথর থেকে সেই পাখী জীবন্ত হয়ে গান গাইতে গাইতে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে এল।

সবাই অনুভব ক'রলে যে, তারা তাদের আত্মাকে ফিরে পেয়েছে।

দেশশুদ্ধ লোক তখন সেই ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের জয়ধ্বনি ক'রে উঠ্‌ল।

সেই সময় খবর পাওয়া গেল যে, অত্যাচারী রাজা সেই সমবেত জয়ধ্বনি শুনে প্রাণত্যাগ করেছে!

এইবার নতুন করে আত্মার হল মুক্তি!

মানুষ আবার মানুষকে ভালবাসতে শিখল।

মাটি-মা

মধুতুলসী গাঁয়ের জনার্দন মোড়লের একমাত্র ছেলে বৈকুণ্ঠ যেবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করলে, জনার্দন হাঁক-ডাক পেড়ে, হৈ চৈ ক'রে পাড়ার দশজনকে ডেকে, একেবারে যজ্ঞি-ব্যাপার জুড়ে দিলে।

মোড়লগিন্নি বললে, "ছেলে পাস দিয়েছে ব'লে সাপের পাঁচপা দেখেছ নাকি? টাকাগুলোকে এমন ক'রে নয়-ছয় করছ কেন? পাসই দিক আর যাই করুক—ও তো আমাদের সেই বোকুই আছে শেষ পর্যন্ত সেই লাঙলই তো ধরতে হবে। মিছিমিছি এত হুল্লোড় ক'রে মরছ কেন?"

হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে, আধবোঁজা চোখ না খুলেই, বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে জনার্দন মোড়ল জবাব দিলে, "তুমি বোঝো না, গিন্নি। বৈকুণ্ঠ আমাদের গাঁয়ের মুখ আলো ক'রে দিয়েছে। ও কি আর যে-সে পাস!"

এর আগে মধুতুলসী গাঁয়ে কেউ পাঠশালার গণ্ডীই পেরোতে পারে নি—সেখানে কিনা একেবারে ম্যাট্রিক-পাস! জনার্দন মোড়লের অতি উল্লাসকে দোষ দেয়া যায় না! কিন্তু তাই ব'লে যাত্রা, পাঁচালী, তরজা এ সবের পেছনে টাকা খরচ করা, আর গাঁয়ের লোকদের খাওয়ানো-দাওয়ানো…ব্যাপারটা মোড়লগিন্নির আদপেই ভাল লাগে নি।

তাই বৈকুণ্ঠের মা আবার ভাল ক'রে মনে করিয়ে দিলে, "দেখ,

কুঁজোর জল গড়িয়ে খেলে আর ক'দিন ? তবু যদি বুঝ্তাম যে, ছেলে ভাল রোজগার করতে শিখেছে, তা হ'লে না হয় একটা কথা ছিল। টাকাকড়িকে এমন ক'রে খোলাম কুচি ভাব্তে নেই! তাতে মা লক্ষ্মী রুষ্টু হন।"

জনার্দনকে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখা গেল না। গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানতে টানতে বললে, "হুঁ,! তোমার যেমন কথা গিন্নি! গাঁয়ের মধ্যে বৈকুণ্ঠ রোজগার করবে না তো, কে করবে শুনি ? পেটে ধরলেই ছেলেকে চেনা যায় না। ওকে আমি লাঙল ধরতে দেবো মনে করেছ ? যাও যাও—হাঁড়ি ঠেলতে এসেছ, হাঁড়ি ঠ্যালো গে যাও।"

জনার্দন মুখে চোখে বিশেষ রকম বিরক্তি ফুটিয়ে তুললে।

মোড়ল গিন্নি গজ-গজ করতে লাগল, "লাঙল ধরবে না! একেবারে লাটসায়েব হয়ে গেছেন আর কি! আমার শ্বশুর লাঙল ধরেছে, সোয়ামী লাঙল ধরেছে, আর পেটের পুত সায়েব হয়ে গেছে! কপালে অনেক দুর্গতি না থাক্লে কেউ এমন কথা মুখে আনে ? শুনলে মা লক্ষ্মী মুখ ফিরিয়ে নেন না ?"

মোড়ল এ-কথাতেও উত্তেজিত হ'ল না। শুধু হাস্তে হাস্তে বললে, "অনেক পড়াশুনোয় বৈকুণ্ঠের শরীরটা কাহিল হয়ে গেছে। ও দিদির বাড়ি থেকে ঘুরে আসুক ক'দিন। জায়গাটাও ভাল, দুধ-দই, পুকুরের মাছ—বাড়ির চেয়েও সেখানে অঢেল।"

গিন্নি বুঝতে পারল, ছেলেকে নিয়ে ট্যাক্‌ট্যাক্ করা পছন্দ নয় মোড়লের।

বৈকুণ্ঠও তাই চায়। শহর থেকে নতুন কেনা জামা আর জুতোর

সদ্‌ব্যবহার করা যাচ্ছে না এখানে। গাঁয়ের পথে চলতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠ্যাকে! হয়তো পা মচ্‌কে হোঁচট খেয়েই পড়বে! এখানে নতুন জুতো-জামা প'রে পথে বেরোলেই, সমবয়সীরা টিটকারি দেয়—“অনভ্যেসে চন্দনের ফোঁটা কপালে চচ্চড় করে।”

ব্যাগের মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে বৈকুণ্ঠ যেদিন পিসীর বাড়ি রওনা হ'ল, সেদিন সন্ধ্যে থেকেই একটা কালো বেড়াল বাড়ির আনাচে-কানাচে কেবলই ম্যাও—ম্যাও ক'রে অকল্যাণ ডেকে ফিরতে লাগল। নিশুতি রাতে একটা কালপ্যাঁচা ডাকতে লাগল নারকেলগাছের মাথায় ব'সে। তাড়িয়ে দিতে প্যাঁচাটা উড়ে গেল বটে, কিন্তু মোড়ল গিন্নির মনটা মুশ্‌ড়ে রইল।

সারাদিন দিব্যি ভাল মানুষ জনার্দন মোড়ল; কিন্তু হঠাৎ শেষরাত্তির থেকে এমন ভেদ-বমি শুরু হ'ল যে, কয়েক বারের পরেই তার কথা বন্ধ হয়ে গেল!

সনাতন কোব্‌রেজ বালাপোষ গায়ে দিয়ে এসে নাড়ি দেখলেন পেট টিপলেন, জিব দেখলেন, চোখের কোণ ফাঁক ক'রে অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর মন্তব্য করলেন, “শিবের অসাধ্য ব্যাধি।”

মোড়লগিন্নি শহরে লোক পাঠিয়ে ডাক্তার ডাকালেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। পরদিন বেলা বারোটার মধ্যেই জনার্দন মোড়ল সংসারের হিসেব-নিকেশ অসমাপ্ত রেখেই পরপারের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন।

লোক গেল খবর নিয়ে। তার সঙ্গে বৈকুণ্ঠ যখন বাড়ি ফিরে

এল, তখন রাত হয়ে গেছে। আশ্বস্ত হ'ল সবাই—বাসি-মড়া হ'ল না যাহোক।

ছেলের সঙ্গে মায়ের প্রথম মতান্তর হাল শ্রাদ্ধের ব্যাপার নিয়ে।

ছেলে বললে, তার বাপ ছিল গাঁয়ের মোড়ল; আর তা ছাড়া সারা গাঁয়ের মধ্যেই সে-ই প্রথম ম্যাট্রিক-পাস করেছে, স্থতরাং বাপের শ্রাদ্ধ ঘটা ক'রে করতে হবে।

মাঁ জবাব দিলে, "নয়-ছয় ক'রে সব উড়িয়ে দিলে তো চলবে না। বাপ তোমার জন্যে কী রেখে গেছে, আগে ভাল ক'রে খতিয়ে ছাখ। সাধারণ-ভারে বাপের শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ কর—তার পর লাঙল নিয়ে মাঠে বেরোও।"

কিন্তু মায়ের কোন কথাই ছেলের কানে মধুবর্ষণ করল না। তার বাপ মারা গেছে—এ-কথা যদি ফলাও ক'রে সারা গাঁয়ে জানানোই না হ'ল, তবে বাপের ম'রে লাভটা হ'ল কী?

মায়ের পরামর্শ বৈকুণ্ঠ একান্তভাবে বাহুল্য মনে করল।

একদল শুভানুধ্যায়ী বন্ধু-বান্ধবও জুটে গেল এ-সময়। তারা সৎ-পরামর্শ দিলে—ছেলে যদি বাপের স্থনামই বজায় রাখতে না পারে, তবে লোকে সে-ছেলেকে বলে বংশের কুলাঙ্গার। গাঁয়ের মোড়লের শ্রাদ্ধ ঘটা ক'রে না করলে, পাস-করা ছেলে দশের কাছে মুখ দেখাবে কী করে?

বন্ধুদের পরামর্শে বৈকুণ্ঠ সবার আগে মায়ের গয়নাগুলো বিক্রি করে ফেললে। বিধবা হয়েছে মা, গয়না রেখে করবে কী?

কল্‌কাতা থেকে এলোকেশীর কেত্তনের দল না নিয়ে এলে

শ্রাদ্ধ জম্‌বে কী ক'রে? বাড়িতে ভিয়েন বসাতে হবে,—নিজ গ্রাম ছাড়া, আশপাশের গাঁয়ের লোককেও নেমন্তন্ন ক'রে দেখিয়ে দিতে হবে—শ্রাদ্ধ কা'কে বলে!

বৈকুণ্ঠের মনে হতে লাগ্‌ল যে, বাবা এই-সময় আচ্‌মকা ম'রে গিয়ে ওকে বিরাট একটা কাণ্ড-কারখানা করবার সুযোগ দিয়ে গেছে।

ছেলের এলাহি কারবার দেখে মায়ের মুখের কথা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে! কে যেন বোবাকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে তার মুখে। শ্রাদ্ধের আনুষ্ঠানিক কাজগুলো হাতে হাতে করা ছাড়া মা ছেলেকে কোন কথা একবার জিজ্ঞেসও করতে আসছে না। কিজানি কোন্ দিক থেকে আবার নতুন ক'রে আঘাত আস্‌বে!

শ্রাদ্ধের ফলার খেয়ে পেটুক বামুন থেকে ভুঁড়েল চাষী পর্যন্ত একেবারে ধন্যি-ধন্যি করতে লাগল। বন্ধুর দল বৈকুণ্ঠের পিঠ চাপ্‌ড়ে তারিফ্ ক'রে বললে, "আরে, ভাই, বাপ তো মরে অনেকেরই, কিন্তু এমন শ্রাদ্ধ করতে পেরেছে এ গাঁয়ে কোন্ বাপের ব্যাটা!"

বাপ যেন রাজত্ব রেখে গেছে—বৈকুণ্ঠর ভাবখানা এইরকমই। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেলে সে সংসারে হাত দিলে। প্রথমেই সে বৈঠকখানা ঘরটা তক্তপোষ আর ঠেবিল-চেয়ার পেতে ভাল ক'রে সাজিয়ে ফেললে। জনার্দন মোড়লের আমলে এই-ঘরটাতে গোরুর রাখাল-ছোঁড়া একদিকে শুয়ে থাকত, আর-এক-দিকে বাইরের লোক এলে শোবার ব্যবস্থা ছিল, আর ছিল তামাকের সাজ-সরঞ্জাম। রাখাল-ছোঁড়াই প্রত্যহ ঘরটাকে পরিষ্কার রাখ্‌ত আর মোড়লের তামাক সাজত।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে থিয়েটারের দল করল বৈকুণ্ঠ। রোজ সন্ধ্যে হ'লেই বাঁয়াতবলায় চাঁটি, হারমোনিয়মের প্যাঁ-পোঁ আর বেহালার তানে পাড়ার লোক সচকিত হয়ে উঠ্ল, আর অন্দরে মোড়লগিন্নি নীরবে চোখের জল ফেল্‌তে লাগল।

সখীর দল জোগাড় করতে বৈকুণ্ঠকে এপাড়া-ওপাড়া, এ গ্রাম-সে গ্রাম ঘোরাঘুরি করতে হয়—তাই সে হঠাৎ একদিন একটা সাইকেল কিনে নিয়ে এল।

মা জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ রে, আমাদের এমন দুঃসময় যাচ্ছে, তার ওপর তুই একটা সাইকেল কিনে নিয়ে এলি?"

বৈকুণ্ঠ জবাব দিলে, "সে তুমি বুঝ্‌বে না, মা। আমার এখন কত কাজ! পাড়ার লোকেরা আমাকে থিয়েটারের ডিরেক্টার করেছে। সব দায়িত্ব তো আমারই। বাবা ছিল গাঁয়ের মোড়ল, আর, আমি হলাম ডিরেক্টর।"

এক বিঘে জমি বিক্রি হয়ে গেছে—সাইকেল কেনার আড়াইশ' টাকা জোগাড় করতে, বৈকুণ্ঠ না বললেও তার মা তা' টের পেয়েছে।

মোড়ল গিন্নির বুক ঠেলে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। এই জমিই ছিল জনার্দন মোড়লের প্রাণ। গতবার যখন অগ্রহায়ণ মাসে ধান পেকে উঠেছে মোড়লের সঙ্গে মোড়লগিন্নি গভীর রাত্তিরে ধান-ক্ষেত দেখতে বেরিয়েছে। চাঁদের আলোর জোয়ার বয়ে যেত, আর এলোমেলো বাতাস যখন সোনা-রঙের পাকা ধানের ক্ষেতে ঢেউ তুল্‌ত, স্বামী-স্ত্রী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাক্‌ত—চোখের পলক আর পড়ত না। মোড়লগিন্নি মা-লক্ষ্মীর পায়ে মনে মনে

প্রণাম ক'রে বল্‌ত—"এমনি দয়া যেন মা তোমার চিরকাল থাকে।"

মোড়লের ক্ষেতের ফসল দেখবার জন্য সারা গাঁয়ের লোক ঝুঁকে পড়ত। কতবার সরকারী পুরস্কার পেয়েছে মোড়ল—নতুন বীজ পাঠিয়ে দিয়েছে সরকার মোড়লকে! সেই সোনা-ফলানো জমির এক বিঘে ছেলে বিক্রি ক'রে দিলে,—মাকে একবার জানাবারও দরকার মনে করে নি!

হাল থেকে ছাড়িয়ে এনে, হাট থেকে পাক্‌ড়ে ধরে, দোকান থেকে খোশামোদ ক'রে বেশ কয়েকটা ছোক্‌রা জুটে গেছে। তারা গলাফাটা চিৎকারে সখীর গান দোরস্ত করছে। তাদের জন্যে মাঝে মাঝে মারা হচ্ছে খাসি, পাঁঠা, ভেড়া—! মোড়লের পাঁঠা-ভেড়া-খাসির পাল নিঃশেষ হতে লাগল।

এরপর হাত পড়ল দুধোলো গাইতে। একটা হাত-ঘড়ি কিন্‌তে হবে। পুরোনো হারমনিয়ামটা সেকেলে ধরণের—নতুন ধরণের একটা চাই। স্টোভ একটা কেনা দরকার—নইলে মহড়া দিতে দিতে চা-পানের অসুবিধে হয়। মোড়লের আমলে মুড়ি-গুড়ই এ বাড়িতে সুখাদ্য ব'লে বিবেচিত হত।

মোড়ল গিন্নি একদিন ছেলেকে ডেকে বললেন, "বাবা, আমাকে না হয় কাশী রেখে আয়। এখানে আমার আর মন টিকছে না।

ছেলে বললে, "সে কী কথা! আমাদের থিয়েটার না দেখে যাবে কী?"

মা লক্ষ্য করলেন, তাঁর চ'লে যাওয়ার প্রস্তাবে কোন আপত্তি তুল্‌ল না ছেলে।

তাঁর ধারণা ছিল, ছেলে কিছুতেই মাকে যেতে দিতে চাইবে না। এই অবহেলা মা'র বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধে রইল। থিয়েটার দেখানোর জন্যেই যা কিছু আগ্রহ, নইলে মা বাড়ি ছেড়ে চলে যাক্ —বৈকুণ্ঠের তাতে কোন আপত্তি নেই।

বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে মায়ের। এক এক সময় আবার শিউরে ওঠে মা। এতে তার ছেলের অকল্যাণ হবে না ত? নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দেয়;—না না, মায়ের দীর্ঘশ্বাসে কি ছেলের অকল্যাণ হয় কখনও!

থিয়েটারের স্টেজ বাঁধ্‌তে হবে। কাউকে কিছু না জানিয়ে বৈকুণ্ঠ আরো কিছু জমি ছাড়িয়া দিলে। কিন্তু কথাটা গোপন রইল না—মা ঠিকই জান্‌তে পারলে।

মোড়ল গিন্নি ছেলেকে কিছু না ব'লে, নিজের কাছে যা সামান্য কিছু ছিল তাই সম্বল ক'রে, গাঁয়ের একটি ছেলেকে নিয়ে একদিন কাশী রওনা হয়ে গেল। মনে আশা রইল, ছেলে ছুটে গিয়ে নিশ্চয়ই তাকে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে যায়—মা অকারণে চোখের জল ফেলে! না আসে কোন অনুরোধ, না কোন চিঠি—না আসে ছেলে নিজে।

মা ভাবে, এখন মরণ হ'লেই বাঁচি!

এদিকে বৈকুণ্ঠ থিয়েটার নিয়ে আরো মেতে উঠেছে! আর হু'দিন পরে অভিনয় হবার কথা। গাঁয়ের লোককে দেখাতে হবে 'আলমগীর' নাটক। নাওয়া-খাওয়ারই সময় নেই বৈকুণ্ঠের—মায়ের কথা মনে পড়বে কী!

কিন্তু নাটক করতে চাই জমকালো সাজ-পোশাক। তার জন্য

চাই টাকা। অথচ, আর জমি বিক্রি করতে তার মনে বাধ্‌ল। ভাব্‌ল, ঘরের কিছু তৈজসপত্র ছাড়িয়ে দেবে। কী হবে এত সব থালা-বাসন রেখে! বৈকুণ্ঠ গেল বাজারতলায় কাঁশারির দোকানে কথা-বার্তা বলতে।

দুপুরবেলাই সে বেরিয়ে পড়ল,—বেলাবেলি আবার ফিরতে হবে; সন্ধ্যেবেলা এখন রোজই জোর রিহার্শেল দরকার।

কাঁশারিও চাষী-গৃহস্থ, তবে চাষ-আবাদের জমি বিশেষ নেই; আজ ক'বছর ধ'রে এই দোকানেরই আয়ে সে কিছু কিছু ক'রে জমি বাড়াচ্ছে। বৈকুণ্ঠ যে-জমি বিক্রি করেছে, এই কাঁশারিই তা কিনেছে। এবার আর বৈকুণ্ঠ জমি বেচ্‌বে না শুনে সে খুশি হল না; কিন্তু বাসন-কোসনের কথায় একটা কথা মনে পড়তে তার দুটো চোখ জ্বল্‌জ্বল ক'রে উঠ্‌ল। সে বলল, "ঘরের বাসন-পত্তর ঘরেই থাক বাবাজি, আমিই বলছিলাম কী—তোমাদের সেই লক্ষ্মীমূর্তিটা আছে না পেতলের? সেটা ছাড়িয়ে দাও। ওর তো পূজো-আর্চ্চা হচ্ছে না—তোমার মা চলে গিয়ে অবধি।"

তা বটে। কিন্তু বৈকুণ্ঠের যে অনেক টাকা দরকার। ওটি বিক্রি ক'রে আর কত টাকা পাওয়া যাবে?

কাঁশারি বল্‌ল, "ঠাকুর পিতিমের দাম কি আর পেতল-কাঁসার ওজনদরে হয়, বাবা? আর, ও হচ্ছে কোন্ কালের সাবেকি বিগ্‌গেরো।"

বৈকুণ্ঠের বাবা একবার একটা নতুন জমি কিনে, তাতে হাল দিতে গিয়ে ওই পেতলের লক্ষ্মীমূর্তিটি পায়। বছরকার যত লক্ষ্মীপূজোর দিনে সেই থেকে ওতে পূজো হয়ে আসছিল, তা

ছাড়া রোজ মা তাকে গন্ধপুষ্প-ধুপদীপ আর যখন যা জুটত ফলভোগ দিত। মা চ'লে যাবার পর থেকে সে সব পাট উঠে গেছে। বৈকুণ্ঠ মানে না ওসব কুসংস্কার।

সবাই বলে, ওই লক্ষ্মী পাবার পর থেকেই নাকি লক্ষ্মী বাঁধা হয়ে ছিলেন জনার্দনের সংসারে! হাসি পায় বৈকুণ্ঠের। মানে না সে ওসব বাজে কথা। বোকা কাঁশারি যদি ওইটুকু পেতল নিয়ে অত টাকা দেয়, বৈকুণ্ঠের লাভই তাতে। খুশিমনেই সে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করে, কিন্তু মুখে হাসি কেন ফোটে না, মনটা কেন কেবলই ওঠে ভারি হয়ে?

নীলমণিদের বৈঠকখানার পাশ দিয়ে ফিরছে বৈকুণ্ঠ, কানে এল, ঘরের ভেতর যেন থিয়েটারের কথাই চলছে হৈ চৈ সহকারে।

মজা করবার জন্য নিঃশব্দে সাইকেল থেকে নেমে বৈকুণ্ঠ দাঁড়াল গিয়ে বৈঠকখানার বাইরে। নীলমণি হচ্ছে থিয়েটারের বিরাট পাণ্ডা—বৈকুণ্ঠের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। সে বলছে, "থাকৃত বাপের জমানো টাকা, তাই ভেঙে যদি লবাবি করতিস তো বুঝতাম যে, হ্যাঁ, বড়লোক। জমি বেচে, গয়না বেচে, তৈজস বেচে থেটারের টাকা জোগাচ্ছিস, তোর বড়মানুষির ক্যাঁথায় আগুন। শেষ যেদিন কাঁথা-কাপড় বিক্রি করতে নামবি, কুলোর বাতাস দিয়ে সেদিন গাঁ থেকে বের ক'রে দেবো।"

একজন ঠাট্টা ক'রে বললে, "বাবু ম্যাট্‌টিরিক পাস দেছেন, গাঁয়ে থাকবেন কী গো। চাকরি করতে যাবেন বাবু কল্‌কেতা-শহরে।"

"ছোঃ ছোঃ!" নীলমণি বলল, "ম্যাট্‌ম্রিক পাস ক'রে আজ-

কাল বেয়ারার চাকরি জোটে না, জানিস ? কত বি-এ, এম-এ ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছে, তার ম্যা-ম্যা-ম্যাট্রিক !”

নিঃশব্দেই চ'লে এল বৈকুণ্ঠ।

সন্ধ্যেবেলা রিহার্শেল দিতে এল সবাই। বৈকুণ্ঠ বলল, “সবাই চাঁদা দাও পাঁচ টাকা ক'রে ; তাই দিয়ে সাজপোষাক আসবে। থিয়েটারের আমি ডিরেক্টর ব'লে সবই আমায় দিতে হবে এমন কী কথা আছে ?”

সবাই ফিরে গেল, বলে গেল—ভেবে চিন্তে পরদিন জানাবে। কিন্তু জোর ক'রে কেউই বলে গেল না—চাঁদা দেবে।

সে-রাতে বৈকুণ্ঠের আর ঘুম আসে না। কেন যেন কেবলই ওর মায়ের মুখখানি ভেসে ওঠে। বড় করুণ সে মুখখানি। মায়ের পরনে ছেঁড়া ত্যানা! শেষ রাতে ঘুম আসে তার চোখ জুড়ে। বৈকুণ্ঠ ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্ন দেখল বৈকুণ্ঠঃ ভূমিলক্ষ্মী এসে ওর শিয়রে দাঁড়িয়েছেন। স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ঘর ভরে গেছে। কিন্তু লক্ষ্মীর কপালে রক্তের দাগ!

ব্যস্ত হয়ে বৈকুণ্ঠ কী যেন জিজ্ঞেস করতে গেল ; কিন্তু মুখ দিয়ে তার কোন কথা ফুটল না।

ভূমিলক্ষ্মী কথা কইলেন।

মনে হল যেন এক সঙ্গে বীণা-বেণু বেজে উঠ্ল। লক্ষ্মী বললেন, “তুমি তোমার বাপের হাত ধ'রে যখন ক্ষেতে যেতে, তখন তোমাদের ওপর ছিল আমার আশীর্বাদ। তোমার বাবার ছিল অদম্য উৎসাহ আর অসীম পরিশ্রম করবার ক্ষমতা। তাই আমি উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছিলাম সোনার ফসল তার ক্ষেতে।

কিন্তু বাপ মারা যাবার পরই তুমি অমানুষ হয়ে গেলে! মা চ'লে গেল বাস্তুভিটে ছেড়ে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে! তাকে একবার ডেকেও ফেরালে না। একে একে জমিগুলি ছেড়ে দিতে লাগ্‌লে। আঘাত পেলাম আমি। তাইতো আমার কপালে রক্তের দাগ দেখ্‌তে পাচ্ছ। এখনও যদি তুমি জমির মর্ম বোঝো, তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়, হাল চালিয়ে, সার দিয়ে, বীজ বুনে, জল সেচে আবার তার বুকে ফসল ফলাতে পারো, তবেই আমি তোমার বাস্তুভিটায় থাকব। নইলে এখানে আর আমি পা রাখ্‌তে পারছি নে। বড় জ্বালা এখানকার মাটিতে, আমার পায়ে ফোস্কা পড়ছে। তোমার মায়ের পূজোয় খুশি হয়ে বলেছিলাম, চিরকাল তাঁর বাঁধা হয়ে থাক্‌বো; কিন্তু তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তুমি আমাকেও বিদায় দিতে চলেছ? মাটি-মাকে ভুলেই তোমার এই দুর্গতি। মায়ের হাজার কাজ থাক্‌লেও যেমন দুরন্ত শিশু তার বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বুকের সুধা পান করে, তেমনি কৃষাণকে ছুটে যেতে হবে—মাটি-মায়ের বুকে। সেখানে হাল চালিয়ে জমি চষতে হবে, উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হবে; তবেই না মাটি-মা খুশি হয়ে সোনালি ধানে ক্ষেত ভরে দেবে! সেই মাটি-মাকে তুমি ভুলেছ! অভাগা তুমি!"

আচম্‌কা ঘুম ভেঙে গেল বৈকুণ্ঠের! ভাবলে, এক নিছকই স্বপ্ন! তাড়াতাড়ি শয্যা ছেড়ে বাইরে এল বৈকুণ্ঠ। শিশির-ধোয়া জমি যেন তাকে মায়ের আদরে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে।

অনেক কাল মায়ের আদর পায়নি সে। তাই আদর-লোভী

ছেলের মত সে এগিয়ে গেল। পূব আকাশে শুকতারা তখন জ্বল্‌জ্বলে প্রদীপ ধরেছে।

লোকে বলে ভোরের স্বপন সত্যি হয়। সে মাকে ফিরিয়ে আনবে—তারপর ফিরে যাবে তার ভুলে-যাওয়া মাটি-মায়ের নরম বুকে ; কাঁধে থাকবে ঠাকুর্দার আমলের হালখানি !



অরণ্যের কানাকানি

অরণ্যের কানাকানি শুনেছ কি নীরব সন্ধ্যায় ?
বনানী-বিহগদের নীড় পানে যবে মন ধায় ?
একা একা বসেছ কি—ঝিঁ-ঝিঁ ডাকা শাল-বন তলে ?
মনের স্ফুলিঙ্গ সম যেথা শুধু জোনাকিরা জ্বলে ?
যেখানে পরীরা আসে, শুনেছ কি নূপুরের ধ্বনি ?
তৃণদল শিহরণে প্রজাপতি ওঠে রণরণি !
স্তব্ধ সেই সন্ধ্যা রাতে বসেছ কি অরণ্যের কোলে ?
চুপি চুপি পাতা ঝরে, না-বলা-কী সুর এক দোলে !

কাল রাতে আমি ছিনু অরণ্যের মর্মমাঝে একা···
মনে মনে আশা ছিল—বুঝি পাবো পরীদের দেখা !
তারার কাঁপন-লাগা, আধো ঘুমে, আধো জাগরণে—
অরণ্যের আত্মা যেন ডাক দিল অঙ্গুলি হেলনে !
কচি কিশলয়ে জাগে মর্মরিত এ কিরে হিল্লোল !
মনের ময়ূর বুঝি রঙীন পাখায় দিল দোল !

বন-পতঙ্গের পাখে—জাগিল কি নূতন ইসারা ?
আমি একা বসে আছি···শির 'পরে জ্বলে কোটি তারা !
অকারণ ঝরে পড়ে টুপ্‌টাপ্‌ বনের কুসুম···
মন মোর একা জাগে চোখে নাই এক ফোটা ঘুম !

মনে হল পরী নাচে, আশে-পাশে, নিকটে ও দূরে—
অরণ্যের মৃদু হাসি জেগে ওঠে নব এক সুরে !
কদম্বের শিহরণ অনুভব করেছ কি মনে ?
ভীরু-লতা দোল খায়, নিজেরে সে অসহায় গনে !
কোথা কোন বন-পাখী সঙ্গোপনে একা দেয় শিষ—
ম্লান জ্যোছনায় জ্বলে মণি শিরে শুধু আশীবিষ !
থমকি দাঁড়ায় দূরে স্তব্ধ রাতে বনের হরিণী—
ওরে বুঝি সাড়া দিল পরীদের হাতের কিঙ্কিণী !
ছায়া আর জ্যোছনায় মরি মরি একি আলিপনা !
শব্দহীন সরোবরে ডুব দিয়ে শুধু কাল গনা !
শাল বনতলে শুয়ে একা আমি তারা ভরা রাতে
অরণ্যের কানাকানি শুনি যেন কার ইসারাতে !

এত সুখ সয়না !

খোকা-খুকু ভাইবোন
একা থাকে বাড়ীতে
আছে কত খেল্‌না—
সন্দেশ হাঁড়িতে !
দাঁড়ে আছে কাকাতুয়া
টিয়া আর ময়না···
খোকা-খুকু পরায়েছে
তাদেরকে গয়না !
আছে যে বেড়াল পুষি
ভুলো আছে কুকুরই
কেবল পাহাড়া দেয়
রাত-দিন-ত্বকুরই !
চাকর রয়েছে জেনো
নাম তার দাম্‌ড়া···
দেখতে বেজায় কালো
গণ্ডার চামড়া !
খোকাদের বাগানেতে
কত আম ফল্‌ত
দাম্‌ড়ার খাওয়া ভাই
দুই হাতে চল্‌ত !

স্বপনবুড়োর ঝুলি

বাগানে গেলেই বলে
টক্ আম খেয়ো না…
মিছি মিছি জ্বরে ভুগে
কষ্টটা পেয়োনা !
আম যদি খেতে চায়
খোকা-খুকু বিকেলে
দাম্ড়া কেবলি কয়
এখুনি যে কি খেলে !
ভরা পেটে খেলে পরে
পেটটা যে ফাঁপবে—
ঘন ঘন বমি হবে
শুধু মাথা কাঁপবে !
মাংস যখনি আসে
ভুলোটারে খাওয়াতে
তাড়াতাড়ি দাম্ড়া যে
বাঁধে তারে দাওয়াতে !
চুপচাপ গোপনেই
করে নিজে রান্না
গপাগপ্ খেয়ে বলে
কেন পায় কান্না !
হাঁড়ি ভরা মালপোয়া
আসে কত মিষ্টি,

দাম্‌ড়া দেয় না কারে
একা করে ফিষ্টি!
বলে, দেহে বল নেই,
মুখে নেই রুচি গো…
কবে ভাই মরে যাবো—
ভগবানে খুঁজি গো!
এ বাড়ীতে যত আছে
পশু আর পাখী গো
বলে, অনাহারে প্রাণ
কি করে যে রাখি গো!
একদিন রাত্তিরে
করে সবে যুক্তি—
দাম্‌ড়ারে দেবো সাজা
হল এই চুক্তি!
শিংয়ে যে গুঁতোয় গরু
খাবি খায় দাম্‌ড়া—
খোকা-খুকু হেসে খুন
খুশী হই আমরা!
উল্‌টে-পাল্‌টে পড়ে
দাম্‌ড়াটা গোয়ালে!
পৈতৃক প্রাণটারে
বুঝি আজ খোয়ালে!

অনাহারে কাঁদে দাঁড়ে
        কাকাতুয়া ময়না…
ক্ষিদের জ্বালায় প্রাণ
        তাদের ত' রয় না!
দাম্‌ড়ারে দেয় ওরা
        নাক-কান কামড়ে
পাজি বলে, বাপ বাপ্‌!
        খেতে দেবো থামরে!
আস্তাবলের ঘোড়া
        মেরে দিল চাঁটি ত!
বলে, ওরে দাম্‌ড়া,
        এ দাওয়াই খাঁটি গো!
গোটাগুটি তিন মাস
        নিতে হবে শয্যা…
এত দিনে ওরে চোর
        পাবি কিরে লজ্জা?

ভুলো বলে এইবার
        চোখ নেবে ঠুক্‌রে—
কেঁদে বলে দাম্‌ড়া
        পাবো বড় দুখ্‌রে!

স্বপনবুড়োর ঝুলি

ছেড়ে দাও ভুলো ভাই,
রোজ দেবো পাঁঠা ত'
সারা দেহ ছড়ে গেছে
ফুটে আছে কাঁটা ত!
সেই থেকে একেবারে
ভালো হল দাম্‌ড়া
খোকা-খুকু দুধ খায়
খুশী হই আমরা···
হাততালি দিয়ে নাচে
ভুলো পুষি ময়না!
গরু ঘোড়া হেসে বলে,
এত সুখ সয় না!

তিন উৎসবের পত্র

আজ সব কাজ রইল পড়ে—সবাই তোলো ফুল,
সবার মনেই জ্বাল্‌বে আলো যেন না হয় ভুল।
বাসন্তী রঙ্‌-সাড়ী পরে বোনের দলে চলে,
ফুল তোলা আর মালা গাঁথা চল্‌ছে কুতূহলে !
শ্বেত চন্দন ঘষ্‌বে হাতে, সাজাও বরণ ডালা,
তিল, তুলসী, বেলের পাতা, নানান্‌ রঙের মালা !
কালির দোয়াত উল্‌টে দিয়ে দুধ দিয়ে তাই ভরো...
আজ প্রভাতে খাগের কলম বাগিয়ে সবাই ধরো—।
অঞ্জলি দাও সবাই মিলে বীণাপাণির পায়—
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাও যদি আঁধার দূরে যায় !

* * * * * *

তেইশে জানুয়ারীর কথা আমরা সবাই স্মরি...
বীর নেতাজীর কথায় মোদের চিত্ত আছে ভরি !
তাঁহার জনম দিনে মোরা বীরের পূজা করি—
ফিরবে কবে বীর নেতাজী ? দুঃখ যাবে সরি !

সুভাষ বসুর ছোট্ট মেয়ে অনিতা তার নাম…
দেশের মেয়ে ফিরলে দেশে—পূরবে মনস্কাম !
প্রণাম করি ভারত্ মায়ের সেরা ছেলের পায়…
যাঁহার ত্যাগে মায়ের পায়ের শেকল ছিঁড়ে যায় !

* * *

স্বাধীনতার-দিবস্-কথা মোদের মনে পড়ে—
হাজার মানুষ মুক্তি পেল বিপ্লবেরই ঝড়ে !
ছাব্বিশে সেই জানুয়ারী রক্ত-রেখা দিনে…
প্রতি বছর নতুন করে লই যে মোরা চিনে !
সোনারকাঠি, তিনটি দিবস তোমরা ভুলো নাকো—
তোমাদের ওই নতুন খাতায় সবাই লিখে রাখো !
হাজার-হাজার ভাই-বোনেরে প্রীতি জানাই ভাই—,
তোদের লেখা তোদের হাতে তুলে দিলাম তাই।

সাদা-কালো

শুধুই কি আর মন্দ দিয়ে মাল্যখানি গাঁথা ?
জড়িয়ে আছে মন্দ-ভালো, সাদা-কালোর পাতা।
ফুল কি রে ভাই অমনি ফোটে—
সুবাস কি তার অমনি ছোটে—
রঙীন কুসুম, কালো ভ্রমর প্রলাপ বকে যা-তা !

আলোর পাশে আঁধার আছে তাই ত বীণার সুর—
ঢেউয়ের দোলায়, সুরের ধারায় পরাণ ভরপুর !
রাধার পাশে কৃষ্ণ কালো—
তিন ভুবনের মন-ভুলালো
মন্দ-ভালোর নামাবলী সবার হৃদয় মাতা !

বসন্ত-উৎসব

ফাগুয়ায় রাঙা আকাশ ডাকিছে
সকল আগল খোল
বসন রঙীন হয়েছে আবীরে
ফিরে এলো ভাই দোল।
দলাদলি ভুলে গলাগলি কর
মন রাঙা হবে জানি তারপর
শুধুই রঙীন বসন আজিকে মনে নাহি দেয় দোল।
রাঙা মন নিয়ে ওরে শিশুদল, সকল বিভেদ ভোল॥

সারা বন রাঙা করেছে কুসুম, মিঠে রাখালের বাঁশী
সোনার কাঠির পরশে জাগিয়া দাঁড়া এসে পাশাপাশি।
ছোঁয়া-ছুঁয়ি দোষ ভুলে যারে ভাই,
রামধনু রঙে সবারে রাঙাই
গানে প্রাণে আজ জেগেছে জোয়ার
তোরা মুখখানি তোল,
মনের কালিমা ধুয়ে দিয়ে রঙে
ফিরে এলো ভাই দোল॥

সকলি যে লাগে ভালো

সকলি যে লাগে ভালো!
এ আঁধারে আর মিছে বসে থাকা, মাটির প্রদীপ জ্বালো।
সেই আলো ধরে দেখি মুখখানি
পয়ারে-ছন্দে তাহারে বাখানি
তুমি যদি নাচো মধুর ছন্দে—দুই হাতে দিব তাল-ও।

সমীরণ এসে মৃদু গুঞ্জনে সুরের কাহিনী কয়—
পাখী নদী আর আকাশের তারা মুখ পানে চেয়ে রয়।
যদি থাকি ঘুমে, যদি জাগরণে,
মনে হয় যেন আছ মোর মনে
মৃদু হেসে তুমি আমার দু'হাতে প্রীতির পশরা ঢালো।

ঘরের ডাক

সারা বেলা ধরে বসে আছি বটছায়
কত যে মানুষ ফিরে এলো এই গাঁয়।
কেউ হাঁটা-পথে, কেউ গুণ টেনে যায়—
চেয়ে চেয়ে মনে কত সুর মুরছায়...
তবু যে আমার বাঁশরী বাজে না হায়!
ঝিলিমিলি রোদে—ছোট ছোট ছায়াগুলি—
কাঁথা বোনে কার চম্পক-অঙ্গুলি—
না গাওয়া সুরের ওঠে যেন ঢেউগুলি—
শেষ-বিহঙ্গ কুলায় ফিরিয়ে যায়
তবু যে আমার বাঁশরী বাজে না হায়।
সন্ধ্যা-তারকা ওঠে গগনের কোণে
জানিনা কি কথা জেগে ওঠে ওর মনে!
কান পেতে সে যে তৃণের প্রলাপ শোনে,
সাঁঝের পিদিম যবে ডাকে ঘরে আয়—
তখনি বাঁশরী ফুকারিয়া গান গায়॥

মহাত্মা গান্ধী

হিংসা কহিল, নত করো শির, হাতে মোর হাতিয়ার,
তব অহিংস-বাণীর উর্দ্ধে অস্ত্র যে ক্ষুরধার।
অহিংস বলে, প্রেমের বাণীতে সদা নীচু মোর শির—
পরশ-পাথরে তোমারো হৃদয় সোনা হবে জেনো বীর!
পুষ্প-পরশে লৌহ হৃদয় না টলে না কভু খোলে—
প্রেমের পূজারী চরম আঘাতে লুটায় ধরণী কোলে!
তনু-হারা হয়ে মহান্‌-আত্মা বাঁচিল বিশ্ব মনে
একটি হৃদয় কোটি দীপ হয়ে আলো দেয় জনে-জনে॥

ক্লান্ত

বন্ধুর পথে, পঙ্কিল মনে চরণ চলে না আর
কোন্ আঁধারের নিহিত গুহায় তব মন্দির দ্বার ?
অবিশ্বাসী এ হৃদয় আমার
আঁকা-বাঁকা পথে চলে বার বার
দুরন্ত বায় করে হায় হায়···এবার হবে কি হার ?

পথের প্রান্তে প্রতিটি চরণে কামনার ফণা দোলে,
আপনার কথা বেশী ভাবি তাই পরাণ তোমারে ভোলে !
কোথায় লুকালে তব বরাভয়
ধ্বনি শুনি কানে এই পথ নয়—
কুহেলী হইতে কোন্ খেয়া যায় জ্যোতির্ম্ময়ের পার ?

প্রীতি-ফাগুয়ার পরশ কোথায় ?

দোল এসে গেছে,—কোথা ওরে ভাই কুম্‌কুম্ গোলা রঙ্ ?
আমি শুধু একা দাওয়ায় বসিয়ে দেখি মানুষের ঢঙ্ !
প্রীতি-ফাগুয়ার পরশ কোথায় ?
মন শুধু তাই করে হায় হায় !
হাসি মুখে নাহি কুশল শুধায়,—জনে জনে রেগে টঙ্ !
আবির অভাবে মানুষের দল দেখ না সেজেছে সঙ !

কালো বাজারের যত কালি ছিল তাই গুলে সবে ছোটে,
মানুষের মনে যত বিদ্বেষ সবে এক জোটে লোটে !
প্রতিবেশী মনে নাই বিশ্বাস—
তাই ত' মানুষ হারায়েছে আশ্,
প্রতিহিংসার কালো বিষ দিয়ে দোয়াতের কালি ঘোটে
এই মন্থনে মানুষের মনে শুধুই বেদনা জোটে !

প্রীতির-ফাগুয়া কোথা ওরে ভাই, কোথা ওরে কুম্‌কুম্ ?
কালি ও কাদায় পাড়ারে মাতায়,—চোখে নেই কারো ঘুম !
এত বিষ ছিল কার মন কোণে ?
কালীয়াদহের ঢেউ কে রে গোনে ?
অমানিশা জাগি আশিবিষ মুখে কৌতুকে খায় চুম্ ?
পঙ্কের মাঝে মানুষ মেতেছে,—তাই কি কালির ধূম ?

আমি বলি ভাই, এসোনা সবাই, মধু-প্রীতি সাথে মাতি,
রাঙা কুম্‌কুম্ ছড়ায়ে কেবলি মিতালির মালা গাঁথি
কেবা একা ওই রয়েছে গো দূরে !
তারে ডেকে আন্ মিলনের পুরে
সবারে বরিব—তাইত পরাণে রঙীন আসন পাতি—
আবিরে গুলাবে ছন্দে ও গানে কাটুক ফাগুন রাতি !

সিংহ-বাহিনী

এসো মা দুর্গে, জগজ্জননী, সিংহ-বাহিনী মাতা—
দুঃখের বোঝা হল যে মা ভারী,—
এসো গো ভুবন ত্রাতা
আজো যে জগৎ অসুরের ভয়ে সারা,
দানব-দলনী বহাও রক্ত ধারা
এ কলুষে তব আসন হয়নি পাতা,
এসো মা, এসো মা, সিংহ-বাহিনী মাতা ॥

রক্ত বীজের বংশ হয়নি শেষ
তীক্ষ্ণ তোমার খড়্গে জননী, কর সবে নিঃশেষ।
আজো গৃহ হারা তব সন্তান
কেমনে মা গাই আগমনী গান ?
বিবস্ত্রা নারী হেরিয়া আজিও বাসুকি নাড়েনি মাথা।
এসো মা, এসো মা, সিংহ-বাহিনী মাতা ॥

আজো যে মা শুনি প্রবলের রোষে দুর্ব্বল কেঁদে মরে,
তোমার যতেক পুত্র-কন্যা পড়ে ওই ঘরে ঘরে।
আজও যে মেদিনী অপমান-ভীতা—
এসো মা, শোনাও জীবনের গীতা,
মারণ অস্ত্র এনেছে অসুর, দূর করো যতো বাধা,
এসো মা দুর্গে জগজ্জননী, সিংহ-বাহিনী মাতা ॥

শোনো মা দুর্গা

শোনো মা দুর্গা, জননী মোদের, সব দুর্গতি নাশো,
সন্তান তব কর-জোড়ে ডাকে—তাহাদের ভালোবাসো।
কাছে ডেকে সবে রাখো মাথে হাত,
তাদের জীবনে আসুক প্রভাত!
অসুর দলনী, বরাভয় দিয়ে শুধু মৃদু মৃদু হাসো!

অন্নপূর্ণা জননী যাহার—সে কেন ক্ষুধায় মরে?
ভিখারী বাপের ছেলে তাই কিগো ক্রন্দন প্রতি ঘরে?
বাণী ও কমলা তব দুই মেয়ে
সবাই তাদের পথ পানে চেয়ে—
সিদ্ধিদাতা ও দেব-সেনাপতি দেখিবার অভিলাষ-ও
সিংহবাহিনী, দাঁড়াও সমুখে, শুধু মৃদু-মৃদু হাসো।

তোমার আশিস্

তোমার আশিস্ অরুণ-কিরণ ধারা—
সব মলিনতা নিমেষেই হয় হারা
পুণ্য-আলোকে অবগাহি মন,
তোমার করুণা যাচে অনুখণ…
এ আঁধার মনে ফুটিল কি শুকতারা ?
তোমার আশিস্ অরুণ কিরণ ধারা

তোমার আশিস্ মায়ের স্নেহের কোল—
আধো-আধো ভাষে শিখালে কত কি বোল !
পঙ্ক ছাড়িয়া জেগেছে কমল,
পাপহীন প্রাণ—আলো ঝলোমল
পুণ্য-পরশে ভেঙেছে পাষাণ-কারা।
তোমার আশিস্ পুণ্য-কিরণ ধারা !

তোমার জনম দিন

আজি তোমার জনম দিন !
রাঙা ঊষা তাই আবীর ছড়ায়, সমীরণে বাজে বীণ !
ফুল্‌গুলি ফুটে ছড়ায় সুবাস
মনে হয় বুঝি আজি মধু মাস
ঝল্‌মলে সাজ, মধুর হাসিতে আঁধার হয় বিলীন !

তোমার জনম দিনের বাঁশরী করে মোরে ঘর ছাড়া...
বিহগ আজিকে নব সুরে গায়, শোনে আকাশের তারা।
জনম দিনের হাসি-খুশী-গান
আজীবন তব থাক্ অম্লান
কামনা জানাই, জীবনের তান যেন নাহি হয় ক্ষীণ
অসীম পুলকে, প্রাণের সলিলে তুমি উজ্জ্বল মীন !
আজি তোমার জনম দিন !

সবাই যদি বৈঠা ধরে

সবাই যদি বৈঠা ধরে চলবে গাঙে নাও—
হাল ধরেছে পাকা মাঝি, বইছে মধুর বাও !
তাল দিয়ে গা ভাটিয়ালী
কলধ্বনি উঠ্‌ছে খালি—
কেন তুমি প্রাণের ভয়ে এদিক-ওদিক চাও ?

মাথার পরে গাঙ্‌চিলেরা দেখায় সহজ পথ,
পার হবো ভাই খেয়া—যখন পুরবে মনোরথ।
নদীর জলে চাঁদের খেলা
হাল্‌কা মেঘে ভাসায় ভেলা
ঝড়ের মাতন লাগ্‌লে তুমি আপনি অভয় দাও ॥

সূর্য ওঠার স্বপ্ন দেখিস্

যদি না সূর্য ওঠে, কুয়াশাতে ছায়রে গগন,
তোরা কি থাক্‌বি বসে—আসবে কবে সেই সে লগন !
উঠে আয় রাত্রি ঘোরে।
দুর্বিপাকেই ডাক্‌ছে তোরে—
তোরা সব এক সাথে ভাই, থাক্‌বি প্রদীপ জ্বালায় মগন ॥

যদি না জ্বল্‌বে আলো আঁধার রাতে
সূর্য্য ওঠার স্বপ্ন দেখিস্ তারার সাথে।
সে রাতের কৃষ্ণাতিথি
আলোর তৃষায় জাগ্‌বে নিতি—
কুয়াশা যাবেই সরে, রঙীন ঊষা দেখ্‌বি তখন ॥

মেঘ মেয়েরা

মেঘ মেয়েরা ছড়ায় যে জল রূপোর ঝারিতে—
শীতল করে নে দেহ-মন পুণ্য বারিতে !
বৃষ্টি-ফাগে ভরল যে শির
আকুল হাওয়া হয় যে অধীর
ঝাপ্‌সা দেখি দুই নদী তীর
নীরব সারি যে !
মেঘ মেয়েদের ভিজ্‌ল শাড়ী তাড়াতাড়িতে !

উতল হয়ে উঠ্‌ল যে আজ নবীন কঁদম ফুল,
আন্‌মনা ওই মেঘ মেয়েদের উড়ছে এলো চুল !
রঙীন পেখম ছড়ায় ময়ূর—
স্বর্গপুরী আর কত দূর ?
সমীরণেই শুনি সে সুর
সাগর পাড়ি দে—
মেঘ মেয়েদের রূপোর ঝারি নেবো কাড়ি রে !

গোপাল ভাঁড়

ছেলেবেলা থেকে হাসির সঙ্গে যে নামটি মিশে আছে
আজ দেখি সেই গোপাল ভাঁড় যে, দাঁড়ায়েছে এসে কাছে !
নিশুতি রজনী, ঝরঝর জল, বাইরে ডাকিছে ঝিঁঝিঁ,
আমি একখানি বই হাতে ক'রে শুয়ে আছি মিছিমিছি
হঠাৎ আমার ঘরের পেছনে শুনি খল্‌খলে হাসি···
তারপর ভাই হাসির সঙ্গে মিলে গেল তারি কাসি !
খক্‌খক্‌ করে কাসে কেরে ভাই ? ঠক্‌ঠক্‌ লাঠি ঠোকে
মনে ত' পড়ে না, ছেলেবেলা থেকে দেখেছি কখনো ওকে !
হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনেছি রে, বহুদিনকার ও যে বটতলা-ছবি···
ছেলেবেলাকার হারানো কাহিনী মনে পড়ে গেল সবি ।
গোপাল ভাঁড়ের কত যে কাহিনী লুকায়ে পড়েছি ভাই···
পড়েছি, হেসেছি, আজ বুড়ো হয়ে সব কথা মনে নাই !
তবু ভুলি নাই বটতলা-ছাপা কাঠে-খোদা ছবি-খান !
ছেলেবেলা ওর হাসির দমকে হয়েছি যে খান্‌-খান্‌ !
লাঠি ঠুকে ঠুকে সেই বুড়ো আজ এলো যে ঘরের মাঝে,
হেসে বলে "ভাই, আমারে ভুলেছ আজি অকাজের কাজে !
বাঙলা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে ডেকে কই—
তোদের সবার মুখে-চোখে আজ প্রাণখোলা হাসি কৈ ?

অকালপক্ক তোরা যে সবাই এ কি রে মুখের ছিরি !
কঙ্কালসার চেহারা দেখে যে মোর মন করে রি-রি !
পেট ভরে তোরা খাবি সবে আর হাসিবি মনের সুখে—
নুয়ে পড়া যত দেহ দেখে ভাই ধাক্কা লাগিছে বুকে !
বাঙ্‌লা দেশের একি দুর্গতি ? হাসিটুকু গেল ক্ষয়ে···
বাঁচার নামেই ধুকিছে মানুষ, মরিতেছে রয়ে রয়ে !"
কহিলাম তারে, "হে গোপাল ভাঁড়, কতটুকু জানো ভাই ?
তোমার দেখা সে সোনার বাঙ্‌লা আজ আর বেঁচে নাই।
দুধে-ভাতে সব থাকিত বাঙালী, ঘি-ভাতে নধর দেহ
পালা-পার্বণে হাসি ছিল মুখে, তারা বেঁচে নাই কেহ !
গোলাভরা ধান, পুকুরের মাছ, বাগানের মিঠা ফল
ভাগাভাগি করে নিয়ে গেছে আজ নয়া-রাজনীতি দল।
তাই বাঙ্‌লার সানাইয়ে কেবল কান্নার সুর শুনি···
নতুন করিয়া হাসির হল্লা জাগাইয়া তোলো গুণি !
তোমার ভুঁড়িতে আছে রসিকতা, পেটে আছে কৌতুক···
তার ছিঁটে-ফোটা ছড়াও, তা হলে ভরিবে বাঙালী বুক।
হাজার রকম কচ্‌কচি মাঝে পরাণ বাঁচেনা ভাই,
অনাবিল হাসি, রসিকতা টুকু আবার যে পেতে চাই !
বাঙ্‌লার ঘরে আসরে-আসরে জাগাইয়া তোলো হাসি···
তবেই বাঙালী বাঁচিবে আবার সবাকারে ভালোবাসি।"

পূজোর চিঠি

শরৎ কালের নীল গগনে চল্‌ছে যেমন মেঘ,
নৌকো আমার নদীর জলে পেয়েছে সেই বেগ !
হেথায়-সেথায় শাপলা-কমল রয়েছে ভাই ফুটে
মৌমাছি আর ভ্রমর দলে নিচ্ছে মধু লুটে !
কাশের বনে ডাক দিয়ে যায়, বইছে মধুর হাওয়া
নদীর জলে নৌকো পরে চল্‌ছে মোদের গাওয়া।
শরৎ কালের সবুজ শোভা দেখ্‌বি কেরে আয়—
হাল্‌কা বায়ে বৈঠা ঘায়ে নৌকা চলে যায়।
তীরে যদি দুঃখ আছে,—হেথায় আছে প্রীতি
সকল জনে বাসতে ভালো পরাণ জাগে নিতি।
পায়নি কেবা পূজোর কাপড়—কাঁদ্‌ছে একা ঘরে—
নৌকো মাঝে প্রীতির রাখী আছে তাহার তরে।
আপন জনে হারিয়ে কাহার চক্ষে বহে জল ?
নৌকো মাঝে ঠাঁই করে নে, দল বেঁধে ভাই চল !
জীবন পথে চল্‌তে গিয়ে হোঁচট্‌ খেলো কেবা ?
তরণীতে আয়না উঠে—আছে মধুর সেবা !
শিশু-কিশোর, দল বেঁধে আয়, আছে উজল হাসি—
চঞ্চলতার বৈঠা মোরা চালাই বারোমাসই !

স্বপনবুড়োর ঝুলি

দুঃখ, বেদন, বিফলতা আয় না তীরে ছাড়ি—
মন-পবনের নৌকো খানি নেরে সবাই কাড়ি!
মৃত্যু যদি তীরে তোদের,—জীবন পাবি না'য়ে
হার মেনে ভাই অলসতা পালায় প্রাণের দায়ে!
স্বপনবুড়োর সওদা আছে নৌকো ভরা সুখ
তারই লাগি শিশু-কিশোর হল যে উৎসুক!
তাইত ডাকি—দলে দলে নৌকোতে ভাই আয়—
শারদীয়ার সব উপহার আছে যে এই নায়।

পুরীর চিঠি

পুরীর সাগর-সৈকতে বসি বোশেখী-পূর্ণিমায়
তোমাদের কাছে পত্র লিখিতে জ্যোছনায় প্রাণ চায়।
রূপা-গলা ঢল চলে অবিরল কোথা নেই তার শেষ,
মনে প্রাণে শুধু ঝঙ্কারি ওঠে নন্দন-বীণা-রেশ!
চাঁদের জোছনা সাগরের জলে কি কথা যায় গো লিখে
সে কাহিনী যদি পড়িবারে চাও, নব-ভাষা নাও শিখে!
ঝোড়ো হাওয়া শুধু এলোমেলো বয়, ঝিকিমিকি করে আলো,
সাগরে-সমীরে-জোছনায় ঘিরে সবই যেন লাগে ভালো।
জন্ম নিলেন আজিকার দিনে তথাগত ভগবান—
এইদিনে হল সিদ্ধিলাভ আর এই দিনে নির্বাণ!

"শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার" আছে পবিত্র পুরীধামে—
আমরা সবাই মিলিলাম সেথা বুদ্ধ-পুণ্য-নামে !
স্বর্গদ্বারে সমুদ্রতীরে "ভারত সেবাশ্রম"
এই ভবনের তেতালার ঘর তারও মায়া নয় কম !
হেথা স্বামীজীর আতিথ্য লভি বাঁধিনু ক্ষণিক বাসা,
মধু সমীরণ বয় সারাখণ, আমরাও ছিনু খাসা !
জগন্নাথের বিগ্রহ যদি দেখিতে বাসনা মনে,
প্রণতি জানাও যতেক দেবতা প্রদক্ষিণের সনে।
সত্যনারায়ণের পাশেই আছে অক্ষয় বট—
তারই ছায়াতলে বসাও যাত্রী মন-মঙ্গল-ঘট !
রোহিণীকুণ্ড, বিমলারে দেখি—হেরিও গোষ্ঠলীলা,
সাক্ষীগোপাল, গণেশে নমিও—সবে যে সিদ্ধি দিলা !
সরস্বতী ও সাবিত্রী দেবী…নমিও সত্যভামা,
বিশ্বকর্মা ছাড়ায়ে রয়েছে ভদ্রকালী সে বামা !
মহালক্ষ্মীর পদধূলি নিয়ে দুয়ারে বসিও ভাই,
এই মহাদেবী তুষ্ট থাকুন, বর নাও তাঁর ঠাঁই !
পাতালপুরীর মহাদেব আর সূর্য সে নারায়ণ
প্রণাম করিলে,—মণিকোঠা তব হরণ করিবে মন !
অরুণ স্তম্ভ, গরুড় স্তম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণ
স্নান-বেদীতলে পূত মনখানি করিয়া দাও বিলীন !
সুভদ্রা আর বলরাম সাথে আছেন জগন্নাথ—
পবিত্র তব পরাণ লইয়া কর তাঁরে প্রণিপাত !

দেবতারে দেখি প্রফুল্ল মনে প্রসাদ লইও হাতে—
নীলাকাশ তলে রূপালী জোছনা আশিস জানাবে মাথে।
সারা পুরী জুড়ে এখানে-ওখানে আছে যে পুণ্য ঠাঁই
সে সব যদি না দেখ হে যাত্রী, মনে ত' শান্তি নাই!
যেখানে গোপনে সাধনা করিত যবন সে হরিদাস,
"সিদ্ধ বকুল" রয়েছে দাঁড়ায়ে সেইখানে বারো মাস।
রাধাকান্তের মঠের মাঝারে চৈতন্যের ঘর—
সাধুর পাদুকা, জীর্ণকন্থা আপন করেছে পর।
শ্বেত গঙ্গার মিলন হয়েছে আদি গঙ্গার সাথে
পুণ্য সে বারি অঞ্জলি ভরি নিও গো পথিক মাথে।
সার্বভৌম বাসুদেব হেথা জ্বেলেছে জ্ঞানের আলো,
জীর্ণ ভবন কাঁদিছে আজিকে, তবু যে লাগিল ভালো।
মার্কেণ্ডেয় সরোবর দেখি—নরেন্দ্র সরোবর
নৌকার পরে জগন্নাথ যে বাঁধে দু'দিনের ঘর।
সেই সে শীতল সরোবর তীরে বিজয়কৃষ্ণ ধাম
এই আশ্রমে বিশ্রাম করি শান্তি ত' লভিলাম।
তাঁহার যোগ্য শিষ্য যে ভাই কুলদা ব্রহ্মচারী
পুণ্য ভবন দাঁড়ায়ে আজিও গাহে জয় গান তারই!
আঠারো নালার করুণ-কাহিনী শুনিও পথিক পথে,
দু'নয়ন ভরি অশ্রু আসিবে, থামিবে না কোনো মতে!
মাসীর বাড়ির পিঠের লোভেই জগন্নাথের আসা,
এই নিরিবিলি ধাম তব ভাই লাগিবে বড়ই খাসা।

শ্রীচৈতন্য-বিষ্ণুপ্রিয়ার চরণ-যুগল-ছাপ—
পরশ করিয়া তোমার মনের ঘুচিবে মনস্তাপ !
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর হেরি—যাও যদি সোজা চলে—
"সোনার গৌরাঙ্গ" তোমারে ভোলাবে কতই ছলে !
বীর হনুমান সমদ্রতীরে হল যে প্রহরী নিজে,
পুণ্য সে ধাম চক্রতীর্থে মনে জাগে কত কী যে !
ভারত প্রদক্ষিণের পথেই শঙ্কর মঠ গড়ে
পাতাল পুরীতে আপনার হাতে শিব প্রতিষ্ঠা করে।
সব দেখা-শোনা শেষ করে ভাই নামিও সাগর জলে…
ঢেউয়ের দোলায় ভাসে তনু-মন কী বিপুল কুতূহলে
জীবনের যত পাপ-তাপ-শোক সমুদ্র নেবে মুছে—
জাগিবে পরাণ নব-গৌরবে, দুঃখ যাইবে ঘুচে।
তাইত তোদের আশিস জানাই সমুদ্র তটে বসি—
হেথায় আসিয়া টানিবি সবাই জগন্নাথের রশি !

বিজয়ার চিঠি

কাছে ও দূরের সোনার কাঠিরা, যে যেখানে সবে আছো—
জানি জানি ভাই, উৎসব দিনে খালি প্রাণ খুলে নাচো।
এখনো ঢাকের আওয়াজ থামে নি, সানায়ের সুর শুনি—
কেবা কয় শত প্রতিমা দেখিলে—তাই বসে বসে গুনি !
কেউ বা শান্ত, কেউ বা চপল, গম্ভীর কেউ আছো—
বিজয়ার দিনে ডেকে কই সবে,—শতেক বছর বাঁচো।
তোদের জানাই বিজয়ার প্রীতি, কোলাকুলি, ভালোবাসা।
তোদের নিকটে অনেক যে পাবো,—স্বপনবুড়োর আশা !
মহাভারতের সন্তান তোরা, কেউ ছেলে কেউ মেয়ে—
নতুন করিয়া ওঠ্ সবে আজি জাগরণী গান গেয়ে।
বিজয়ার প্রীতি, ভালোবাসা আর মধুর আলিঙ্গন—
সব ব্যথা গ্লানি দূর করে দিয়ে পুলকিত হবে মন।
তোমাদের দেয়া প্রীতির রাখীটি কত না পরেছি হাতে—
তোমাদের গাঁথা মালা গলে পরি—হৃদি আনন্দে মাতে।
তোমাদের প্রীতি, তোমাদের গীতি, ক্ষণিক মধুর হাস্—
আনন্দে রাখে মনখানি মোর, সুখে থাকি বারো মাস।
কত রকমের অনুরোধ আসে, মজাদারী নাম চাই...
হিমসিম্ খেয়ে গেলাম বন্ধু, তালিকা শূন্য তাই !
কত ফুল দেছ হাতে তুলে ভাই, দিয়েছ যে নব প্রীতি...
স্বপনবুড়োর জীবনে তাহাই—নিত্যি শোনায় গীতি।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

দেশে দেশে দেখি খালি হাসি মুখ, শুনি শুধু কলরব,
তোদের জীবনে যেন না ফুরায় মধুর এ উৎসব !
বিজয়ার দিনে ভাই-বোন সবে, বিজয়ের কথা কই—
মনে মনে ভাবো, "আমরা বিরাট, আমরা ত' ছোট নই।"
মহাভারতের ছেলে মেয়ে তোরা, বিরাট তোদের মন—
তোরা বড় হবি—এই কথা ভেবে হিমালয় জেগে রন্।
গঙ্গা তোদের হৃদি-স্পন্দন, বিন্ধ্য তোদের আশা,
ভারত-সাগর-কল-কল্লোলে শুনি যে তোদের ভাষা !
যে যেখানে তোরা আছিস ছড়ায়ে, তোরা যে আপন ধন !
তোরাই মোদের ঈশের আশিস্—এই কথা বলে মন।
কটু কথা যদি কয়ে থাকি কারে, রেখোনা মনের মাঝে
তোদের মধুর হাসি-গীতি-কথা নিয়ত হৃদয়ে রাজে !
কাছে ডেকে সবে শুধাই কুশল, মাথে রাখি শুধু হাত
তোদের জীবনে জাগুক অরুণ, দূর হোক কালো রাত।
প্রণাম জানায়ো গুরুজন পদে, শিক্ষক কাছে নতি—
বিপদে ধৈর্য হারায়োনা কভু, ভগবানে থাক্ মতি।
তোমাদের যত যশ-সৌরভে ভরুক ভারত ভূমি—
হৃদয় সবার মাতিয়া উঠুক তোমাদের মুখ চুমি।
দোষ যদি কিছু করে থাকো ভাই, ক্ষমা চেয়ে নিও হেসে—
তোদের মুখেই নিজে ভগবান জেগেছেন ভালবেসে।
শারদীয়া দিনে মধু-অবকাশে সবে ভালো থাকো ভাই,
স্বপনবুড়োর এ ছাড়া জীবনে অন্য কামনা নাই।

বর্ষার চিঠি

আষাঢ় মাসের বৃষ্টি ঝরে টিপির টিপির ভাই—
আজকে আমার বাইরে যাবার কোনো তাড়াই নাই!
আয় না সবে আসর বসাই ছোট্ট কোণের ঘরে,
সবাই মিলে বোস না ঘেঁষে,—বৃষ্টি কেবল ঝরে!
পটলি মাসি, দে আমাদের ঝাল ছোলা আর আদা,
গ্রামোফোনে রেকর্ড চড়া—বকে বকুক দাদা!
সব-ভুতুড়ে গল্প বলো ঠাকুরদাদা এসে—
তুল্‌বো তবে ওই পাকা চুল আমরা ভালোবেসে!
না হয় তোরা কাগজেরই নৌকো ভাসা জলে,
বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর—দেখ্‌বো কুতূহলে!
অঙ্ক-কষা আজ তোলা থাক্, গর্জে যে ভাই বাজ,
নৌকো আমার পথ হারালো সাত সাগরের মাঝ!
ঝোড়ো হাওয়ায় কোথায় চলে পক্ষীরাজের ঘোড়া?
এখনো কি চুপ্‌টি করে থাক্‌বি বসে তোরা?
তার চেয়ে আয় বৃষ্টি জলে খুব করে ভাই ভিজি
গলির মোড়ে সাঁতার কাটি সবাই মিছিমিছি!
ডিগ্‌বাজি খাই, কেবল লাফাই, চিৎ-সাঁতারে ভাসি—
জান্‌লা থেকে যতই চ্যাচান জ্যাঠামশাই আসি!

তর্‌তরে ওই জলের স্রোতে সরপুঁটি ভাই ধরি,
এক সাথে আয়, সবাই মিলে বর্ষারই গান করি !
না হয় তোরা ক্ষ্যান্ত পিসির কানে কানে বল
চাই খিচুড়ি, ইলিশ ভাজা, মান্‌বো নাকো ছল !
সার দিয়ে সব পাশাপাশি বসি বারান্দায়—
তপ্ত খিচুড়ীটা যে ভাই সবাই খেতে চায় !
না হয় চলো রথের দিনে বাজাই ভেঁপু বাঁশী,
গরম গরম পাঁপড় ভাজা বৌদি ভাজুক আসি !
হাঁক্‌চে যে মেঘ, ঢাল্‌ছে যে জল, ডাক্‌ছে ব্যাঙের দল,
না হয় কদম বনে গিয়ে গাঁথবি মালা চল !
বনের পথে মেঘের ডাকে নৃত্য করে শিখি,
ক্ষণপ্রভা গগন-কোণে চল্‌ছে চিঠি লিখি !
এমন দিনে আসর মাঝে কাব্য পড়ি শোন্
টাপুর-টুপুর বৃষ্টি ধারায় আকুল হল মন !

পথ চলার গান

এম্‌নি করেই পায়ে-পায়ে পথ চলি—
বিঘ্ন-বাধা যাবো রে ভাই সব দলি।
উঠুক রে ঝড় জাগুক তুফান
অগ্রগতির গাইবো রে গান
মাথার উপর আকাশ ভাঙে, গাঙ্‌ ডাকে ভাই ছল্‌ছলি।
এম্‌নি করেই পথ চলি।

জোয়ার জলের তালে-তালে ভাসিয়ে দেবো নাও
শক্ত হাতে হাল ধরেছি,—যতই আসুক বাও!
অমানিশার রাত্রি শেষে
উঠ্‌বে অরুণ মধুর হেসে
পথের নেশায় উচ্চ-আশা জাগ্‌ছে মনে চঞ্চলি—
এম্‌নি করেই পথ চলি।


আলোচনার আসর

ফুল ফোটানোর খেলা

বসন্তের বৃক্ষ যেমন অজস্র ফুল ফোটায় আর ফল ধরায়—একবার তাকিয়েও দেখে না সে ফুল মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল কিনা, কেউ তাতে মালা গাঁথল কিনা, অথবা কেউ সে ফুল দুপায়ে মাড়িয়ে গেল কিনা !

গাছের আনন্দ সে ফুল ফুটিয়েই খুশী। সে ফুলে পূজার অর্ঘ্য রচিত হল—কিংবা অবহেলায় ছড়িয়ে রইল পথের ধুলোয়, গাছ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না! ফুল ফোটানোর যে আনন্দ, গাছ তাই পুরোপুরি উপভোগ করে। তার বেশী সে কিছু আশা করে না। অজস্র ফুল সে উড়িয়ে, ছড়িয়ে, বিলিয়ে দিয়ে যায়। যার গরজ, সে কুড়িয়ে নিক্ আঁচল ভরে! খোঁপায় গুঁজুক, কিংবা প্রিয়জনের জন্যে মালা গাঁথুক।

এই ফুল ফোটানোর আনন্দ…আর পুলক কবিরা যেমন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এমন আর কেউ নয়।

রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্যে এমনি অজস্র ফুল ফুটিয়ে গেছেন। যারা রসিক তারা সেই পথে এসে দুদণ্ড থম্‌কে দাঁড়ায়, ফুলের শোভা দেখে অবাক হয়, সুবাসে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। সেই ফুল তুলে ফুল্ল মনে ঘরে ফিরে যায়। সেই ফুল ফোটানোর নমুনা দেখ্‌লে বিস্ময়ের আর পরিসীমা থাকে না! কত ধরণের ফুল! কত তার রঙের বাহার!

স্বপনবুড়োর ঝুলি

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫শে বৈশাখকে স্মরণ করে কয়েকটি বিচিত্র ফুল ছোটদের খেলাঘরে এনে তুলে ধরছি। আশা করি, ফুলগুলির মধুর সুবাস, আর রঙের বাহার দেশের ছেলেমেয়েদের আসরে আনন্দের প্রস্রবণ বইয়ে দেবে।

অজস্র ছড়া লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ছোটদের আনন্দ দিতে। একটা নমুনা শোনাই—

টুক্‌রো বাসন চিনেমাটির
মুড়ো ঝাঁটা খড়কে কাঠির
নল্‌চে-ভাঙা হুঁকো, পোড়াকাঠটা,
ঠিকানা নেই আগুপিছুর
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ঠাট্টা ॥"

রাজকন্যা-রাজপুত্তুরের রূপকথা তোমরা ঠাকুমা-দিদিমার মুখে ত কতই শুনেছ! কিন্তু তাদের নিয়ে এমন মজাদার উদ্ভট ছড়া কখনো শুনেছ কি? একটা নমুনা শোনো—

—"কাঁচড়াপাড়াতে এক
ছিল রাজপুত্তর
রাজকন্যারে লিখে
পায় না সে উত্তর!
টিকিটের দাম দিয়ে
রাজ্য বিকাবে কি এ
রেগে-মেগে শেষ কালে
বলে ওঠে—ছুত্তোর!

ডাক বাবুটিকে দিল
মুখে ডালকুত্তোর ॥"

পাঠশালায় তোমরা ত' অনেকেই পড়ো। কিন্তু এ রকম পড়ুয়ার সন্ধান পেয়েছ কি কখনো ?

"পাঠশালে হাই তোলে
মতিলাল নন্দী
বলে "পাঠ এগোয় না
যত কেন মন দি।"
শেষকালে একদিন গেল চড়ি টঙ্গায়,
পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাসালো মা গঙ্গায়
সমাস এগিয়ে গেল,
ভেসে গেল সন্ধি
পাঠ এগোবার তরে
এই তার ফন্দি ॥"

আজকাল আমরা অনেক কাজের মেয়ের সন্ধান পাই। তারা হাতে কাজ করে আর মুখে অনর্গল কথা বলে। কিন্তু এমন পাঁচ বোনের সন্ধান কোথাও কি মিলেছে ?

"ক্ষান্তবুড়ির দিদি শাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কাল্‌নায়—
সাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়
হাঁড়িগুলো রাখে আল্‌নায়
কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা-সিন্ধুকে,

টাকা কড়ি গুলো হাওয়া খাবে বলে
রেখে দেয় খোলা জাল্‌নায়,
নুন দিয়ে তারা ছাঁচি পান সাজে,
চুন দেয় তারা ডাল্‌নায় ॥"

মেয়েদের গয়না পরার কত ফ্যাসান প্রচলিত আছে—সেই আদি যুগে থেকে। কিন্তু কোন্ বিয়ের কনে কানের এমন অপরূপ গয়না পরেছিল সেটা তোমরা খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো—

"দু কানে ফুটিয়ে দিয়ে
কাঁক্‌ড়ার দাঁড়া
বর বলে, কান দুটো
ধীরে ধীরে নাড়া।
বউ দেখে আয়নায়,
জাপানে কি চায়নার
হাজার হাজার আছে
মেছনীর পাড়া
কোথাও ঘটে নি কানে
এত বড় ফাঁড়া!"

শীতের দিনে ঠাণ্ডার দাপটে তোমরা ত' অনেকেই মোজা পরো। কিন্তু সেই মোজা পরার এমন মজাদার ছড়া হতে পারে—সে কথা কেউ ভেবেছ কি?

"মুচ্‌কে হাসে অতুল খুড়ো
কানে কলম গোঁজা

চোখ টিপে সে বললে হঠাৎ
পরতে হবে মোজা !
হাসল ভজা হাসল নবাই
ভারী মজা, ভাব্‌ল সবাই
ঘর শুদ্ধ উঠ্‌ল হেসে
কারণ যায় না বোঝা ॥"

আজকের যুগের ছেলেরা ত' বিজ্ঞান-ধর্মী। তারা সব কিছুই বিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে দেখ্‌তে শেখে। খাদ্যের ভেতর ভিটামিন আছে কিনা, সেটা যাচাই করে তবে খাবার খেতে হবে। কিন্তু ভিটামিনের এমন মজাদার ছড়া—তাও একটুখানি তোমরা চেখে নাও—

"ঘাসে আছে ভিটামিন, গোরু ভেড়া অশ্ব
ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে, আঁখি মেলে পশ্য।
অনুকূলবাবু বলে, ঘাস খাওয়া ধরা চাই,
কিছুদিন জঠরেতে অভ্যেস করা চাই ;
বৃথাই খরচ করে চাষ করা শস্য ॥"

তবে আর কি ? এই ছড়ার ভেতর দিয়েই ত' খাদ্য-সমস্যার সমাধান হয়ে গেল ! আমাদের খাদ্য-মন্ত্রীও হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচলেন।

কিন্তু ছড়ার শেষ অংশটা আরো মজাদার—

"দুদিন না যেতে যেতে মারা গেল লোকটা,
বিজ্ঞানে বিঁধে আছে এই মহাশোকটা,
বাঁচলে প্রমাণ শেষ হোত যে অবশ্য ॥"

আমাদের বাঙলা দেশের সমাজে নানা রকম ঠাট্টার প্রচলন আছে। ঠাকুর্দা-নাতিতে ঠাট্টা আছে, জামাইবাবুর সঙ্গে শ্যালিকার ঠাট্টা আছে, বন্ধুতে-বন্ধুতে ঠাট্টা আছে, বিয়ের বাসরে এয়োদের ঠাট্টা ত' চিরকালের চল্‌তি। কিন্তু সবার ওপর টেক্কা দিয়েছে বরের অভিনব সাজ্ঘাতিক ঠাট্টা !

সেই ঠাট্টার নমুনাটা তোমরা একটু শোনো—

"বর এসেছে বীরের ছাঁদে
বিয়ের লগ্ন আটটা।
পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে,
গালেতে গালপাট্টা
শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
আলাপ যখন উঠল জমে
রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে
মাথায় মারলে গাঁট্টা।
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে,
বর হেসে কয় ঠাট্টা !"

তোমরা ত' নিজেরা মাঝে মাঝে বন-ভোজনের আয়োজন করে থাকো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৌতুক-ছড়ার ভেতর দিয়ে কি রকম নিমন্ত্রণের ঘটা দেখিয়েছেন—সেটা ইচ্ছে করলেই তোমরা মুখস্থ করে রাখ্‌তে পারো—

"রান্নার সব ঠিক
পেয়েছি ত' নুনটা—
অল্প অভাব আছে
পাইনি বেগুনটা।

পরিবেষণের তরে
মোরা আছি সব ভাই,
যাদের আসার কথা
অনাগত সব্বাই।
পান পেলে পুরো হয়
জুটিয়েছি চুনটা—
একটু-আধটু বাকি
নাই তাহে কুণ্ঠা!”

এমন মজাদার ভোজ তোমরা দেখেছ কখনো?

তোমরা যারা পাড়াগাঁয়ে থাকো—বর্ষাকালে ডোবার ধারে কত কোলা ব্যাঙ দেখ! তাদের গ্যাঙোর-গাঙ্‌ শব্দও তোমাদের কানে যায়! কিন্তু সেই কোলা ব্যাঙ নিয়ে কেমন মজাদার ছড়া তৈরী হতে পারে—শুনেই দেখ না!

“ভূত হয়ে দেখা দিল
বড়ো কোলা ব্যাঙ
এক পা টেবিলে রাখে
কাঁধে এক ঠ্যাঙ!
বনমালী খুড়ো বলে—
করো মোরে রক্ষে,
শীতল দেহটি তব
ফুলিয়ো না বক্ষে;
উত্তর দেয় না সে,
বলে শুধু—ক্যাঙ”

তোমরা হয়ত লক্ষ্য করেছ যে, ডাক্তাররা অনেক সময় এমন 'প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্' লেখেন, যা হাজার চেষ্টা করেও পড়া যায় না! তা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ কেমন সুন্দর রসিকতা করে ছড়া লিখেছেন! সবাই মুখে-মুখে বলো, সন্ধ্যেবেলার আসর দিব্যি জমে যাবে—

"পাড়াতে এসেছে এক
নাড়ি-টেপা ডাক্তার
দূর থেকে দেখা যায়
অতি উঁচু নাক তার।
নাম লেখে ওষুধের
এ দেশের পশুদের
সাধ্য কী পড়ে তাহা,
এই বড়ো জাঁক তার।"

এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ কত ভাবে ছন্দ আর মিল নিয়ে ফুল ফোটানোর খেলা খেলেছেন ছোটদের আনন্দ দেবার জন্যে। আমি শুধু তোমাদের গোটা কয়েক নমুনা দেখিয়ে দিলাম।

তবে আমার আশা রইল,—কবি যে মণি-মঞ্জুষা তোমাদের জন্যে সঞ্চয় করে গেছেন—তার চাবিকাঠি তোমরা একদিন খুঁজে পাবে।—তখন কাব্য-রসের ভাণ্ড নিয়ে যে মানসিক-ভোজের আয়োজন হবে, তার তুলনা মেলা শক্ত!

যে এখনো বিদ্যালয়ে যায় না

—যে ছেলে-মেয়ে এখনো বিদ্যালয়ে যেতে সুরু করেনি, তাকে আমরা মুখে-মুখে কিভাবে শিক্ষা দিতে পারি—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সেই কথা জানাতে হবে।

বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও কাজটি অত্যন্ত শক্ত, ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে যাঁরা হামেশা মেলামশা করেন, আশা করি তাঁরা এর গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

আদর্শ ও চিন্তাধারার দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, মন্তেসরি-শিক্ষাপদ্ধতিতে ও রবীন্দ্রনাথের "শান্তিনিকেতনে" প্রকৃতির মধ্যে মেলামেশা আর গল্প শোনার আনন্দ দান কেউ কারও অনুসরণ না হলেও শিক্ষাপদ্ধতি এক ও অভিন্ন।

যে ছেলে বা মেয়ে এখনও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করতে সুরু করেনি, তার মনটা হালকা হাওয়ার মতই অবারিত আর সুদূরপ্রসারী। নতুন মন আর নতুন চোখ নিয়ে সে সারা বিশ্বকে দেখে বেড়াচ্ছে। তাই যা-কিছু দেখে, যা-কিছু শোনে, সব তাতেই সে অকারণ খুসিতে ঝলমল করে ওঠে।

এইজাতীয় প্রাণ-স্পন্দনে উচ্ছল ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে যাঁদের মিতালী পাতাবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা জানেন যে, পুঁথিকে দূরে সরিয়ে রেখে কত সুন্দর ভাবেই না তাদের মনকে জয় করে নেওয়া চলে।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

একটি ছোট ছেলের হাত ধরে একদিন একটা সাজানো-গোছানো বাগানে ঢুকলাম। ছেলেটি তার চার দেয়ালে ঘেরা ছোট্ট ঘরখানির মধ্যেই থাকতে অভ্যস্ত। এমন খোলামেলা জায়গায় সে কদাচিৎ এসেছে। কাজেই এখানে প্রবেশ-অধিকার পেয়ে যা-কিছু দেখে সব তাতেই সে অবাক হয়ে যায়। মনে হয়, যেন বিশ্বের সব-কিছু মজার জিনিষ তার ছোট্ট মুঠি দুটির ভিতর লুকিয়ে রাখে।

কচি কোমল ঘাসে তৈরী গালিচার উপর সে ছুটোছুটি করতে সুরু করে দিল। আশেপাশে যে লাল, নীল, হলদে, সবুজ নানা-রকম ফুল ফুটে রয়েছে, সেগুলি তুলে নেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ দেখতে পেল, কতকগুলি প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে তার নজর পড়ল। ফুল রঙীন বটে, কিন্তু যেখানে-সেখানে উড়ে বেড়াতে পারে না। অথচ মজা দেখ, রঙীন প্রজাপতি ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়াচ্ছে! ঠিক ওই ছোট্ট ছেলেটির চির-তরুণ মনের মত। কাজেই প্রজাপতি তাকে একটি ধরে দিতেই হবে।

এই রঙীন ফুল, সবুজ ঘাস, নরম লতা, রঙ-বেরঙের প্রজাপতি, হালকা মেঘ, কালো পাখী প্রভৃতি দেখাতে নিয়ে আমরা ছোট্ট ছেলেটিকে কৌশলে গল্প করে করে অক্ষর পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। যেমন, 'অ'তে অপরাজিতা ফুল, 'খ'তে খাল, 'গ'তে গরু, 'ঘ'তে ঘাস ইত্যাদি। ছেলেরা বাড়ীতে ইতিমধ্যে যেসব জিনিস চিনে নিয়েছে, তার কথা মনে করিয়ে দিয়েও অক্ষর পরিচয় করিয়ে দেয়া যায়। যেমন, 'খ'তে ঠাকুরদার খড়ম। ছেলেটি হয়তো এই খড়মের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে গেছে। ছেলেদের মন অতি সহজে টানে—ঠাকুমা-দিদিমার মুখে শোনা ছড়া। আমাদের দেশে ছড়ার

অভাব নেই। দোল দিতে ছড়া, খাওয়াতে ছড়া, বেড়াতে ছড়া, ঘুম পাড়াতে ছড়া, ঘুম ভাঙাতে ছড়া। এমন যেখানে ছড়ার ছড়া-ছড়ি সেখানে ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিতালী পাতাতে বাধা কোথায় ?

কতকগুলি ছড়া শিখিয়ে দিলে ছেলে বা মেয়ে আর তার পিছন ছাড়বে না। ক্রমাগত অনুরোধ আসবে—আরও বলো, আরও বলো—

তাই ছেলে-মেয়ের দলে মিশতে গেলে ছড়াকে ভুললে চলবে না। যদি বলা যায়—

"আয় রে পাখী লেজ-ঝোলা,
খোকাকে নিয়ে কর খেলা।
খাবি দাবি কলকলাবি,
খোকাকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি।"

তাহলে যে-কোনও খোকা আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাততালি দিতে সুরু করবে। এমনিতেই তো ছড়ার একটা ছন্দ সহজেই মনকে টেনে নেয় ; তার উপর খোকা যখন বুঝতে পারে যে, তার সম্বন্ধেই কবিতা আওড়ান হচ্ছে, তখন শিশু-মনে এক অনাস্বাদিত পুলকের সঞ্চার হয়, খোকা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। সেই বিশেষ বিশেষ ছড়াটি খোকার মনের মধ্যে স্থায়ী আসন করে নেয়। খোকা জীবনে আর তা ভুলতে পারে না।

এমনিভাবেই যদি বলা যায়—

"খোকা খেলে কোনখানে ?
শাল পিয়ালের বন পানে।

সেখানে খোকা কি করে ?
খোকা খোকা ফুল পাড়ে।”

তাহলে অতি সহজেই শাল-পিয়ালের বন খোকাকে সবার অজান্তে হাতছানি দিয়ে ডাকে। খোকার মন আর ঘরে বদ্ধ থাকতে চায় না। প্রকৃতির খেলাঘরে খোকা নতুন খেলার সাথীর সন্ধান করে এইভাবে খোকার মনে নিজেরও অগোচরে অজানাকে জানবার, দূর দেশে বেড়াবার একটা আকাঙ্খা কচি কিশলয়ের মত বাড়তে থাকে।

এইজন্যই তো “রূপকথা” শোনবার জন্য ছোটদের এত আগ্রহ।

রাত গম্ভীর হতে থাকে ঘরের কোণের মৃদু দীপটি লম্বা লম্বা ছায়া ফেলতে থাকে দেয়ালে। ঝোপে-ঝাড়ে একটানা ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডেকে চলে ; দূরের বনে শেয়াল প্রহর গণনা করে। এমন সময় খোকা-খুকু চোখ বড় বড় করে শুনতে থাকে—ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প, আম্তিকালের বম্তিবুড়ির গল্প, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে রাজপুত্তুর সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয় তার কাহিনী। কোথায় লুকিয়ে আছে কোন্ স্ফটিক-স্তম্ভে রাক্ষসের প্রাণ-ভোমরা সে কথা জানবার জন্য খোকার চোখ থেকে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি ছুটি নিয়ে পালিয়ে যায় ; অভিযানের একটা প্রবল আকর্ষণ খোকা মনের কোণে উপলব্ধি করতে থাকে। খোকা আর চার দেয়ালে-ঘেরা ছোট্ট ঘরে আবদ্ধ থাকতে চায় না। বিশ্বের যা-কিছু অজানা সব জেনে নেবার জন্য তার আগ্রহের সীমা থাকে না।

এইভাবে খোকার মনে যে পক্ষীরাজ ঘোড়া আনাগোনা করতে থাকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে খোকা যখন বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে পড়ে

সেই পক্ষীরাজীই অবলীলাক্রমে বিমানে পরিণত হয়ে যায়। খোকা অতি সহজে সেই পরিবর্তনকে মেনে নেয়।

তার মনে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জাগে না। কোথায় কখন কি পরিবেশে খোকার মনে জানবার আগ্রহ জাগিয়ে দিতে হয়, সে কৌশলটি জানা দরকার। ছোটদের যাঁরা সত্যকার হিতকামী, আশা করি, আমার কথাটি তাঁরা অনুধাবন করতে পারবেন।

আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, 'বাইবেলের' সেই সুন্দর গল্পটি বলতে হয়।

কৃষক বীজ বুনছে মাঠে।

হাতে করে ছড়িয়ে দিচ্ছে বীজ। এই বীজ থেকে গাছ হবে, প্রচুর ফসল ফলবে, কৃষকের চোখে সেই স্বপ্ন। কিন্তু কিছু বীজ গিয়ে পড়ছে আশে-পাশের কাঁটা গাছে, কিছু শক্ত জমির ওপর, কিছু পাথরের ওপর, আর আসল চষা জমির উপর পড়ছে গিয়ে বাদ বাকি বীজ। কাঁটা গাছের মধ্যে যে বীজ পড়ছে, সেগুলি আর গজাতে পারছে না ; শক্ত জমি ও পাথরের উপর যে বীজ পড়ছে পাখীরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলছে, শুধু চষা জমিতে যে বীজ পড়ছে, আর ঠিকমত জল দেয়া হচ্ছে যেখানে, সেখানেই আমরা আসল ফসল পাই।

শিশুদের মনও ঠিক এমনি জমির মত। জোর করে কিছু শেখাতে গেলে, শিশুমন সেগুলো আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে না। ফলে, যেমন সে শোনে তেমনই সে ভুলে যায়। কাঁটা গাছের মধ্যেকার বীজের মত সেগুলি গজাতে পারে না, কিম্বা শক্ত মাটিতে পড়া বীজের মত পাখীতে সেগুলো খেয়ে যায়।

তাই চাষা যেমন বীজ বপন করবার আগে জমিকে চষে নেয়, আমরাও তেমনই ছোটদের কোন কিছু বিষয়ে আগ্রশীল করে তোলবার আগে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে নেব।

সে অনুকূল পরিবেশ হচ্ছে, সুন্দর সুন্দর জিনিষ দেখিয়ে, ছড়া শুনিয়ে, গল্প বলে তাদের মনকে ঝুরঝুরে মাটির মতই নরম করে নেওয়া। মাটিতে আমরা যে বীজই ছড়িয়ে দিই না কেন, ফসল পেতে আমাদের বিলম্ব হবে না।

কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের সজাগ প্রহরীর মত পাহারা দিতে হবে। ব্যাপারটি হচ্ছে, কি জাতীয় বীজ আমরা বপন করছি, সে-দিকে আমাদের প্রখর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ছোটদের মন যখন প্রফুল্ল থাকে, হেলাফেলাভাবে তারা যা-কিছু শোনে তাড়াতাড়ি শিখে নেয়। এর ভাল-মন্দ দুটো দিকই আছে। ভাল কথা শুনে, ভাল ছড়া শুনে, গল্প জেনে রাতারাতি তারা অনেক কিছু শিখে নিতে পারে, আবার খারাপ আলোচনা, বিশ্রী গালাগাল প্রভৃতি শুনে ছোটরা তাও অবিকল নকল করতে সুরু করে দেয়। এ বিষয়ে অভিভাবকদের এবং বাড়ীর লোকদের দায়িত্ব যে কত গুরুত্বপূর্ণ সে কথা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে না বললেও বোধ করি চলে।

যেসব ছেলে-মেয়ের এখনও ইস্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি, ছোট-খাটো ভ্রমণ তাদের মনে অনেকখানি আনন্দের সঞ্চার করে। ধরা যাক, একদল ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমরা চিড়িয়াখানায় হাজির হলাম। এই যাওয়া-আসা ও দেখা অনেকখানি শিক্ষার পথ সুগম করে দেয়। প্রথম কথা, যাওয়ার পথে ছোটদের মনে অনেক

জিজ্ঞাসা জাগে। ট্রাম, বাস, মোটর যাতেই যাওয়া যাক না কেন, ছোটদের কৌতূহলের অন্ত থাকে না। এটা কি, ওটা কি, হামেশা জিজ্ঞাসা কোরে আশ-পাশের লোকদের অস্থির করে তুলবে। এবং এই জিজ্ঞাসার ভিতর দিয়ে সকলের অজান্তে তাদের জ্ঞানের-ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বড়রা কিন্তু এইসব আজে-বাজে প্রশ্ন শুনে বিরক্তিই বোধ করেন এবং ধমক দিয়ে ছোটদের থামিয়ে দেন। ওদের এমনিভাবে থামিয়ে দেয়া মানে—জ্ঞান-ভাণ্ডারের থলিটি এঁটে বন্ধ করে দেয়া !

তার পর চিড়িয়াখানার নিজস্ব যে আকর্ষণ সেটা ছোটদের কাছে একটা বিরাট মানসিক-ভোজ।

কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা দেখবে !

বাঘ, সিংহ, জেব্রা, হাতী, গণ্ডার, সাপ, হনুমান—কতরকম পাখী।

বিস্ময়ের পর বিস্ময় !

বই না পড়েও যেন ক্রমাগত বইয়ের পাতা উল্টে চলেছে।

এক বছর ধরে ক্রমাগত বই পড়িয়ে জীব-জন্তু সম্পর্কে শিক্ষা দিলে যা না হয়, একদিন চিড়িয়াখানা দেখায় তার চাইতে বেশী ফল পাওয়া যায়।

এ আমার মন-গড়া কথা নয়। হাতে-নাতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে।

এই চিড়িয়াখানা দেখার কথা ছোটরা সারা জীবনে ভুলতে পারবে না। অন্ততঃ আমি তো পারিনি ভুলতে ছোটবেলার সেই বিশেষ দিনটির কথা। জীবনের দিন-পঞ্জীতে তা লাল-কালিতে লেখা হয়ে আছে।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

আধুনিক বিজ্ঞানের দৌলতে 'সিনেমা' ছোটদের শিক্ষা দানের ব্যাপারে যে কি অদ্ভুত কাজ করেছে, তা এ সম্পর্কে যাঁরা একটু-আধটু সংগঠনমূলক কাজ করেন, তাঁরাই প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করতে পারবেন।

এই সিনেমার মাধ্যমে ছোটদের ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রাণীতত্ত্ব, প্রাকৃতিক শিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি অতি সহজভাবে বুঝিয়ে দেয়া যায়। সে ব্যাপারে আনন্দের পরিমাণ এত বেশী থাকে যে, ছোটরা বুঝতেই পারবে না, তারা কত নতুন জিনিস শিখে নিল।

বহু পুঁথি থেকে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার চয়ন করে নিয়ে এসে যদি ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যায়, তবে ছোট ছেলে-মেয়েরা বিশেষ খুশি হয়ে তা উপভোগ করবে এবং যা দেখল জীবনে ভুলতে পারবে না।

সেই শিক্ষাই তো আসল শিক্ষা, যা আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করলাম আর সারা জীবনে ভুলতে পারলাম না।

প্রত্যেকের মনে একটা অদেখা শ্লেটে সব-কিছু সুন্দর করে লেখা হয়—আর তা মুছে যায় না।

ছোটদের সেই সুন্দর শ্লেটটির সন্ধান আমরা ক-জন রাখি বা রাখবার চেষ্টা করি?

শান্তিনিকেতনে গান্ধী-দিবস

একবার ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহে হঠাৎ শান্তি নিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

আমার ওখানে পৌঁছুবার দিন দুয়েক পরেই গান্ধী-দিবস পালিত হল আশ্রমে। এই দিনটির মধুময় স্মৃতির কথা আজও ভুলতে পারিনি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "স্মৃতির-পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানিনা, কিন্তু যেই আঁকুক, সে শুধু ছবিই আঁকে।"

এই অদৃশ্য পটুয়ার এক-একটি ছবি এমন উজ্জ্বল রঙে আঁকা হয় যে কোনো দিন মন থেকে তা মুছে যায় না।

শান্তি-নিকেতনে গান্ধী-দিবস এই রকম একটি না-ভোলার দিন।

আমার এক মামিমা শ্রীযুক্তা জ্যোতি সেন তখন থাকতেন—স্বর্গত অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের বাড়ীতে। সেইখানে গিয়েই আমি উঠেছিলাম।

এই গান্ধী-দিবসের কথা আগের দিন দুপুর বেলা শুনেছিলাম—শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মুখে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে মহাত্মা প্রথম যেদিন তাঁর দলবল সহ শান্তিনিকেতনে পদার্পণ করেন সেই দিনটিকে

স্মরণ করে আশ্রমের ছেলেমেয়েরা কি শিক্ষা লাভ করে, সেই কথাই জানাবো।

* * * * *

খুব ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। সাম্‌নেই আশ্রমের বিরাট মাঠ আর লাল রাস্তা হাতছানি দিয়ে আমাদের সাদর-আহ্বান জানালো।

কিছুক্ষণ বাদেই ঘণ্টাধ্বনি শুনে বুঝতে পারলাম—উপাসনা গৃহে উপাসনা হবে এবং একথাও জান্‌তে পারলাম যে, শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন প্রার্থনা করবেন।

আমরাও দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম—উপাসনা গৃহের উদ্দেশ্যে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন জীবিত ছিলেন তখন তিনি ছাতিম গাছের তলায় বসে নির্জ্জনে উপাসনা করতেন। বর্ত্তমান উপাসনা-গৃহ রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় নির্ম্মিত হয়েছে।

পথে বেরিয়ে দেখলাম—দলে-দলে ছেলেমেয়েরা এবং আশ্রম-বাসিগণ রওনা হয়েছেন একই দিকে। তাঁদের আড়ম্বরহীন পরিচ্ছদ, শুভ্র-শুচি মুখ দেখে কল্‌কাতার কোলাহল মুখরিত গড্ডলিকা প্রবাহের কথা মুহূর্ত্তের জন্যে ভুলে গেলাম। মনে হল—বিশ্বকবির আশ্রম স্থাপন এবং 'শান্তি-নিকেতন' নাম সার্থক হয়েছে।

পৌঁছে দেখি উপাসনা গৃহের অভ্যন্তর একেবারে পূর্ণ হয়ে গেছে। বাইরের ঘোরানো বারান্দাটিও নর-নারীতে ভর্ত্তী। এমন একটি দরজার পাশে আশ্রয় গ্রহণ করলাম যেখান থেকে উপাসনা-বেদী ও উপাসনাকারীকে দেখা যায়।

ক্ষিতিমোহনবাবু অতি চিত্তাকর্ষক ভাষায় জানালেন—ভুলে-

যাওয়া সেই সব কাহিনী, যেদিন গান্ধীজী তাঁর দলবল সহ প্রথম শান্তিনিকেতনের অতিথিরূপে আগমন করেন। রবীন্দ্রনাথ সে সময় আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু আতিথেয়তা ও যথাযোগ্য সমাদরের কিছুমাত্র ত্রুটি হয়নি। সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে আশ্রমবাসীরা গান্ধীজীকে বরণ করে নিয়েছিলেন। তোরণ নির্ম্মিত হয়েছিল, বাঙ্‌লার নিজস্ব কারুকলায় আলপনা দেয়া হয়েছিল, মঙ্গলশঙ্খ বেজেছিল আর সব চাইতে বড় কথা—আশ্রমবাসীদের হৃদয়-তন্ত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল—প্রীতি আর আন্তরিকতার সুর! প্রথমবার গান্ধীজী তাঁর পরিবারস্থ সবাইকে (তিনি সঙ্গের সকলকে এক পরিবারভুক্ত বলেই মনে করতেন। গান্ধী-জীবনী দ্রষ্টব্য) রেখেই তাড়াতাড়ি একটি জরুরী কাজে চলে গিয়েছিলেন বাইরে। তারপর কতবার তিনি এসেছেন—গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর প্রীতির ডোর আরো মধুময় হয়ে উঠেছে কিন্তু প্রথম দিনের পদার্পণের কথা আশ্রমবাসীরা আজও ভুলতে পারেনি। তাই সেই ঐতিহাসিক দিনকে কেন্দ্র করে প্রতি বৎসর পালিত হয় গান্ধী-দিবস। মানুষের চলে যাওয়াটা সত্যি নয়—মানুষের সঙ্গে মানুষ সহজাত স্নেহের বন্ধনে যেদিন বাঁধা পড়ে সেই বিশেষ দিবসটি মনের মণি-মঞ্জুষায় অক্ষয় হয়ে থাকে। তাই ত' শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীদের মনে গান্ধীজী আজও উজ্জ্বল। তাঁর আদর্শ প্রত্যেকটি মানুষের মনে বিশ্বাস, সেবা ও মৈত্রীর এক মহান বেদী রচনা করেছে।

এই স্বল্পভাষী মানুষটি অল্প দিনের মধ্যেই আশ্রমকে কি ভাবে আপনার করে নিয়েছিলেন সেই পবিত্র-স্মৃতি-কথা ক্ষিতিমোহন বাবুর মুখে সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলেন।

গান্ধীজীর প্রেরণা পেয়েই বিগত যুগে আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীর দল একদিন স্বাবলম্বী হবার ব্রত গ্রহণ করেছিল। নিজে হাতে তারা বাসন মাজত, ঘরের কাজ করত, রান্না করত এমন কি পায়-খানা পর্যন্ত পরিষ্কার করত। পরবর্ত্তী কালে অবশ্য অধ্যয়নের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেবার ফলে এই ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে নি, তবু সেই মহান আদর্শকে জাগ্রত রাখবার জন্যে এই বিশেষ গান্ধী-দিবসে শান্তিনিকেতনের সবাই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন।

উপাসনা চলা-কালে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নির্ব্বাচিত সঙ্গীত ছেলে-মেয়েরা সুন্দর ভাবে গেয়ে অনুষ্ঠানটির পরিবেশ মধুর ও সুরুচিসম্মত করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথের গান শান্তিনিকেতনে বসে শুন্‌লে যে নতুন অর্থ উপলব্ধি করা যায় সেইদিন সকালে আমরা সে কথা মনে-প্রাণে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম।

উপাসনা শেষে ফিরে আসবার মুখে দেখতে পেলাম আশ্রমের ছেলেমেয়েরা দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। মেয়েরা সম্মার্জ্জনী নিয়ে আশ্রম-সংস্কারের কাজে লেগে পড়েছে, ছেলেরাও নানা কাজে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

পথে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সঙ্গে দেখা। যুগান্তরের "ছোট-দের পাত্‌তাড়ির" ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি একটি ছবি উপহার দেবেন কথা ছিল। আমায় দেখেই বল্লেন, "আজ আর ছবি পাচ্ছেন না। দেখছেন ত' আজ আমরা সবাই ভারী ব্যস্ত।"

তাকিয়ে দেখলাম সত্যি তাই। শিল্পাচার্য্যের হাতে আজ আর তুলি নেই, তার বদলে মাথায় জড়ানো গামছা। ধুতি আটো-

সাঁটো করে পরা। তিনি আজ ছেলের দল নিয়ে পায়খানা পরিষ্কারের কাজে উঠে-পড়ে লেগেছেন।

ছাত্র ও ছাত্রী ভবনে খোঁজ নিয়ে জানা গেল—ভৃত্য ও পাচকের দল আজ ছুটি পেয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরাই বাসনমাজা, বাটনা বাটা, ঘর ঝাঁট দেয়া, কুটনো কোটা, কাপড় ধোয়া, রান্না করা প্রভৃতির কাজে লেগে গেছে। কিন্তু যার যা খুশী সে সেই কাজে মেতে একটি জগা-খিচুড়ী তৈরী করছে না। কার কোথায় দায়িত্ব সেটা আগের দিনই ধার্য হয়েছিল। আশ্রমে ঘণ্টা দেয়া থেকে সুরু করে পায়খানা পরিষ্কার পর্য্যন্ত সব কাজ ছেলেমেয়েদের ছক করা।

এই সব কাজ দেখতে এত ভালো লাগছিল! আম্রকুঞ্জে একদল ছোট ছেলে ঝরে-পড়া-পাতা কুড়িয়ে জড় করছে আর তারই ফাঁকে ফাঁকে স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছে, গান গাইছে। মনে হল দায়িত্ব আর আনন্দকে এরা একই রাখি-বন্ধনে বেঁধে নিয়েছে।

গান্ধী-দিবসের শিক্ষা শান্তিনিকেতন আশ্রমে কী মায়াজাল বিস্তার করেছে সেই কথা চিন্তা করতে করতে আমরা বাসায় ফিরে এলাম। সেদিন দৈনন্দিন কাজ সব নিজের হাতে করতে পারলাম না বলে কেবলি আপনাকে অপরাধী বলে মনে হতে লাগলো!

শিশু-জগৎ

বিচিত্র এই শিশু-জগৎ।

এখানে কাঠের ঘোড়া জল খায়, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী থাকে তেপান্তরের মাঠের শেষে প্রকাণ্ড গাছের ডালে, পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে রামধনুকের রাজপুত্তুর সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে গজমোতি জয় করে নিয়ে আসে।

পিদিমের আলোতে ঠাকুমা বসে মালা জপ করতে করতে গল্প বলেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে তাই গিল্‌তে থাকে। প্রশ্ন করে,—তারপর?

ওদের প্রশ্নের জবাব দেয়া বড় সোজা কথা নয়। যে পারে ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চল্‌তে, মনের কথা বল্‌তে,—তাঁরাই হচ্ছেন শিশু-সাহিত্যিক। অনেকে মনে করেন কাজটা হেলাফেলার। কিন্তু সেটা যে কত বড় জহুরীর কাজ সেটা প্রমাণ করেছেন—রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন, যোগীন সরকার, সুখলতা রাও, সুকুমার রায়, এমনি আরো অনেক রসিক মানুষ। বড় হয়েও যারা ছেলেবেলাকে ভুলে যান না, মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে থাকে—যাদের 'খেলাঘর,' তাঁরাই হচ্ছেন—ছোটদের সত্যিকারের বন্ধু।

শিশু সকলের আগে সাড়া দেয় মায়ের মুখে শোনা ঘুমপাড়ানি গানে।

“ধন! ধন! ধন! ধন!
বাড়ীতে ফুলেরই বন!
এ ধন যার ঘরে নেই—তার কিসের জীবন?
তারা কিসের গরব করে?
আগুন পুড়ে কেন না মরে?”

যে সব ছেলে-মেয়ের খেলার সাথী মা-বাবা—তাদের আমি বলব ভাগ্যবান। অনেক বাবা আছেন···মহাব্যস্ত। ছেলে-মেয়ের দিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই! তারা কি করে মনের মতন পুতুল গড়ে তুলবেন? যে বাড়ীর মা-বাবা ছোটদের নিয়ে আনন্দ আর উৎসব করতে না পারলেন—তিনি জীবনের সব চাইতে বড় সুখ থেকে বঞ্চিত থাকলেন। ছোটদের মন-প্রাণ দিয়ে ভালো না বাসলে শিশু-সাহিত্য তৈরী হবে কি করে?

ছেলেরা সকলের আগে খেলার সাথী পায় মা-বাবা, তারপর খেলাঘর, তারপর প্রাকৃতিক দৃশ্য তাদের মনকে হরণ করে নেয়। ছোট ফুল, লাল পাখী, নীল আকাশ, চাঁদামামা, মিনি বেড়াল, বাঘা কুকুর, ছাগলছানা—যা দেখে তাতেই অবাক হয়। শিশু মনে মনে চায় ওরা কথা বলুক। তাইত বিষ্ণুশর্ম্মা জানোয়ারদের মুখ দিয়ে কথা বলিয়েছেন, গল্প শুনিয়েছেন। সে কাহিনী ছেলে-মেয়েদের কাছে কত প্রিয়! এই সময় শিশুর আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকে। দেখে আর ভাবে আমি যদি ওর মত হতে পারতাম! রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরের অমল ভাবে আমি যদি দৈওয়ালা হয়ে

অমন করে ফিরি করে দৈ বিক্রি করতে পারতাম! শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত গভীর রাত্রে ছাদে শুয়ে কামনা করে, আমি যদি ইন্দ্রনাথের মতো বনে-জঙ্গলে খুশী মনে বাঁশী বাজাতে পারতাম!

ছোট ছেলে-মেয়েরা এই কামনা, বাসনা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রশ্নে-প্রশ্নে বড়দের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। কিন্তু ধমক্ দিয়ে ওদের থামিয়ে দিতে নেই। ছোট্ট একটি কাঠি দিয়ে ওদের মনের প্রদীপ একটু একটু করে উস্কে দিতে হয়। তবেই না ওরা জ্বলে উঠবে!

এই সময়টা বড়রা অনেকেই ছোটদের ধম্‌কে তাড়িয়ে দেন। বাবা অফিসের ফাইল নিয়ে ব্যস্ত, খোকা গিয়ে কাছে দাঁড়ালো। বাবা বল্লেন, খোকা, এখান থেকে যাও—আমার মরবার ফুরসৎ নেই! খোকা বাইরের ঘরে জ্যাঠামশায়ের কাছে হাজির। তখন তিনি পাশের বাড়ীর ভট্‌চাজ মশায়ের সঙ্গে দাবা খেলছেন। তিনি ওর দিকে না তাকিয়েই বল্লেন, এখানে গোল কোরো না খোকা। খোকা তখন একপা-দু'পা করে মায়ের মজলিশে হাজির হল। সেখানে মা-কাকিমা-জ্যাঠাইমারা গয়নার প্যাটার্ণ নিয়ে আলোচনা করছেন। ধমক দিয়ে উঠলেন একজন,—যা-যা বড়দের কথা গিল্‌তে হবে না! ভয়ে ভয়ে খোকা চলে এলো কাকাবাবুদের ঘরে। সেখানে সবাই রাজনীতি আর সিনেমা নিয়ে আসর গরম করে তুলেছে। একজন হুম্‌কি দিয়ে উঠল, ডেঁপো ছেলে, এখানে কি করতে রে—পালা শীগ্‌গির!

খোকা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

কিন্তু এইভাবে পালিয়ে পালিয়ে খোকা দাঁড়াবে কোথায়?

সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবে, আমার মনের কথা বড়রা কিছু বুঝতে চায় না! বড়দের আর ছোটদের মধ্যে ধীরে ধীরে এইভাবে একটা অদেখা-দেয়াল গড়ে ওঠে। বড়রা ভাবে, ছোটরা বেশ আছে! রেশনের কথা ভাবতে হয় না, বাজারের টাকা জোগাড় করতে হয় না। ছোট-বেলায় ছিলাম ভালো। ছোটরা ভাবে, বড়রা যখন যেখানে খুশী যায়, কেউ বারণ করতে নেই। এটা করিসনি, ওটা ওটা করিসনি শুনতে হয় না।

তখন রবিঠাকুরের কবিতা মনে পড়ে—

"নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস—
ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।"

এই নদীতে সেতু গড়তে পারেন শুধু সাহিত্যিকের দল। রাশি রাশি উপদেশ দিলে শিশু-সাহিত্য রচনা করা যায় না। এমন গল্প ফেঁদে বসতে হবে যাতে বড়রা তাদের হাজার কাজকর্ম্মের ভেতরও ছোটদের আরো একটু আপনার করে কাছে টেনে নিতে পারেন, আর ছোটরাও বড়দের ভুল বুঝে দূরে দূরে না থাকে। এমন বহু বাড়ী আছে যেখানে ছেলে-মেয়েরা বাপকে বাঘের মতো ভয় করে। বাবা সারা দিনের কাজের পর বাড়ী ফিরলেন—আর ছেলে-মেয়েরা এ-দরজা, ও-দরজা দিয়ে সুরুৎ-সুরুৎ করে পালিয়ে গেল। কিন্তু বাবার চাইতে বড় বন্ধু আর কে আছে ছেলেদের?

ধীরে ধীরে ধাপে-ধাপে এমন কাহিনী তাদের শোনাতে হবে, আর সোপানের পর সোপান অতিক্রম করে এমন মনের খোরাক জুটিয়ে যেতে হবে যে, একদিন যে ছোট্ট ছেলেটি রূপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়াকে বিশ্বাস করত—সে আর একটু বড় হয়ে বিজ্ঞানের কাহিনী

পড়ে ঠিক বুঝে নেবে যে, পক্ষীরাজ এরোপ্লেন হয়ে গেছে! এতটুকু বেমানান লাগবে না তার চোখে। শিশু যখন ছোট থাকে, মা বুকের দুধে তাকে বাঁচিয়ে রাখেন, তারপর সে গরুর দুধ পায়। আস্তে আস্তে দাঁত উঠলে মাংস চিবিয়ে খেতেও তার কষ্ট হয় না। এই ধাপগুলি সম্পর্কে যদি আমরা সচেতন থাকতে পারি তবে আমাদের কোনো ভয় নাই। দেহের খোরাক, মনের খোরাক সব সময়-মত জুগিয়ে যেতে হবে ছোটদের। আমরা যখন যেখানে আসর বসাবো আমাদের কাজ হবে মায়েদের মুখের ঘুমপাড়ানি গান সংগ্রহ করা, রূপকথা শুনে নেয়া, দেশের মাটি আর মানুষের সঙ্গে পরিচয় করা। এইভাবে যদি আমরা ভারতের সব প্রদেশের ছড়া, লোক-সঙ্গীত, রূপকথা সংগ্রহ করতে পারি সেটা হবে ছোটদের পক্ষে এক বিরাট ভোজ।

আসর করে বসতে হবে ওদের নিয়ে। শোনাতে হবে—দেশ-বিদেশের কাহিনী, কাব্যকথা, গান আর বীরত্বের ইতিহাস।

ছোটদের সঙ্গে ছেলেমানুষ হয়ে আনন্দের ভেতর দিয়ে শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে—ভারতের প্রতি শহরে, প্রতি জেলায়, প্রতি গ্রামে।

এমন একটা সময় আসে যখন প্রত্যেক ছেলে-মেয়ে কবিতা রচনা করে। সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গকে আমরা যেন জোর করে রোধ করে না দিই। ওই কবিতাই জীবনের বিভিন্ন পথকে চিনিয়ে দেবে। শুধু ওদের ওপর সস্নেহ দৃষ্টি রাখতে হবে। যে ছেলেটির গানের দিকে ঝোঁক তাকে যেন আমরা কবিরাজী পড়তে না পাঠাই; যার হাতে রয়েছে সব সময় ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কলা-কৌশল তাকে

ডাক্তারী বিদ্যে শেখাতে গেলে সে শুধু মানুষ মারবে,—দেশের বা দশের কোনো কাজ তাকে দিয়ে হবে না। সব সময় আমাদের মনে রাখতে হবে এই ছেলেটি, বা এই মেয়েটি শুধু তার মা-বাবারই সন্তান নয়—মহাভারতের বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে ওর মধ্যে। আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা আগে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিযোগিতা করত। এ পাড়ার সঙ্গে ও পাড়ার ফুটবল ম্যাচ হবে। কিন্তু এখন আমরা স্বাধীন দেশের মানুষ। দেশের যা কিছু ভালো-মন্দ সব আমাদের জন্যেই হচ্ছে। সবকিছুর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে দেশের ছেলে-মেয়েদের। হয়ত আমেরিকায় হচ্ছে শিল্প প্রদর্শনী, রাশিয়ায় হচ্ছে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, জার্মাণীতে হচ্ছে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা। আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের সেই সব প্রতিযোগিতায় যোগদান করে জয়ের মালা জিনে আনতে হবে। তবেই না আমাদের বুক দশ হাত উঁচু হয়ে উঠবে। সেজন্য চাই শিক্ষা।

আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনে যোগদানের জন্যে আমি যখন ভিয়েনা গিয়েছিলাম—নেতাজীর পত্নী আমায় জিজ্ঞেস করলেন, ভারতের সর্ব্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা কি বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্ত্তিত হয়েছে? আমি জবাব দিলাম, একদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সেই পরিকল্পনা ছিল বটে, কিন্তু আজও ভারতে সে পরিকল্পনা কার্য্যকরী হয়ে উঠতে পারেনি।

ছোটদের সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে হলে—সকল রকমে সংগঠনমূলক কাজের ভেতর দিয়ে তাদের শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু সে শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ ভারতীয় মতে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে

যে শিক্ষার প্রবর্ত্তন করছেন—সেই খেল্‌তে খেল্‌তে শেখা। অভিনয় করে ইতিহাসকে জান্‌তে হবে, বনভোজন করে স্বাবলম্বী হতে হবে। সন্তরণ শিখে দুস্তরকে জয় করবার সঙ্কল্প জাগ্‌বে ছোটদের মনে, পদব্রজে ভ্রমণ করে নিজের দেশের মাটি আর মানুষকে আপনার করে নিতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন সেই ব্রত গ্রহণ করে হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণ করেছিলেন। ভারতের কোথায় লুকিয়ে রয়েছে পুরোনো শিল্পের নিদর্শন, প্রাচীন নক্সার কাঁথা, অদেখা আলপনা—সব দুঃসাহসী ছেলেরাই খুঁজে বের করবে। তীর্থে-তীর্থে ভ্রমণ করে পুণ্য-কলসীতে সংগ্রহ করবে তীর্থ-সলিল।

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের পাঠ্য-পুঁথির আমূল সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় পথ চল্‌তে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়াই, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রাশি-রাশি বইয়ের ভারে বিদ্যালয়ের পথে কুঁজো হয়ে হাঁট্‌ছে। একদিন রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আজ দিন এসেছে। এ বিষয়ে শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তা করতে অনুরোধ করি। প্রতি সপ্তাহে স্বপনবুড়োর কাছে হাজার হাজার চিঠি আসে। বেশীর ভাগ চিঠিতে এই দুঃখের কথা থাকে যে—ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ তাদের মা-বাবা আর চালতে পারছেন না! সবাই যাতে শিক্ষা পায় এই ব্যবস্থা আমাদের মহাভারতের বুকে করতে হবে।

আমাদের দেশে ক'টি ছেলেমেয়ে নিজে কিনে ভালো বই পড়তে পারে? সেই জন্যে গ্রামে গ্রামে যাতে পাঠাগার স্থাপিত হয় সে বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে।

শিক্ষা বিস্তারটা সকলের আগে প্রয়োজন। আর সেই শিক্ষা-দান নানা ভাবে চল্‌তে পারে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা তো আছেই, শুধু তার পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া সিনেমার ভেতর দিয়ে অতি সুন্দরভাবে ছেলেমেয়েদের নানা জিনিস শিখিয়ে দেয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার বইয়ে পড়ে বুঝ্‌তে হয়তো ছোটদের অসুবিধে হয়; কিন্তু অতি জটিল বিষয় সিনেমার সাহায্যে তুলে ওদের দেখালে বুঝ্‌তে কোন কষ্টই হয় না। এইভাবে ইতিহাসের কাহিনী মুখস্থ করতে ছেলেরা মুখে ফ্যানা তুলে ফেলে! তার বদলে যদি শিবাজী, রাণা প্রতাপ কিংবা আকবরের জীবনী অবলম্বনে নাটক লিখে ওরা নিজেরা অভিনয় করে কিংবা সিনেমাতে কারো জীবন-কাহিনী দেখে—তবে কখনো সে কথা আর ভুল্‌তে পারবে না। এইভাবে প্রত্যেকটি শিক্ষণীয় বিষয় চিত্তাকর্ষক করে সিনেমায় তুলে ছেলে-মেয়েদের দেখালে যে হাতে-হাতে ফল পাওয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

রেডিও আর একটি সুন্দর আধার যার ভেতর দিয়ে মুখরোচক গল্প বলে ছোটদের মন অতি সহজেই আকর্ষণ করে নেয়া যেতে পারে। যে বিষয় বিদ্যালয়ের মাষ্টার-মশায়দের শেখাতে এক বছর লাগে—সিনেমা কিম্বা রেডিওর মাধ্যমে তা অতি কম দিনের মধ্যে ছেলেমেয়েদের মনে পাকাপাকিভাবে খোদাই করে দেয়া যেতে পার।

ট্রেনে-ষ্টীমারে-জাহাজে-বিমানে দেশভ্রমণ একটি সুন্দর জিনিস। সে-শিক্ষার কথা পুঁথির পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। নদীর

কল্লোল, পর্ব্বতের ধ্যান-গম্ভীর ভাব, অভিনব প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিচিত্র মানুষের মন—সব কিছু জড়িয়ে দেশভ্রমণ ছোট ছেলেমেয়েদের খুব অল্প সময়ের ভেতর অনেক বেশী অভিজ্ঞ করে তোলে। এ শিক্ষার তুলনা পাওয়া ভার।

ছোটদের ওপর নানারকম কাজের ভার চাপিয়ে দিলে তারা স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা পায়।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, দায়িত্ব নিজেদের হাতে পেয়েছি এই আনন্দে কিশোরদল মাটি কেটে পথ তৈরী করেছে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে নৈশবিদ্যালয় চালিয়েছে, সমবেত প্রচেষ্টায় হাতের লেখা পত্রিকা পরিচালনা করেছে, নিজেদের আঁকা ছবি আর হাতের কাজ দিয়ে সুন্দর প্রদর্শনী সাজিয়ে তুলেছে। এর কোনো কাজটাই তুচ্ছ করবার মতো নয়। শুধু হাতের লেখা কাগজের কথাটাই ধরা যাক্। একখানি কাগজ বের করতে গিয়ে ছেলেমেয়েরা কত জিনিস হাতে-কলমে শিখ্তে পারে। প্রথমে সাহিত্যচর্চ্চার একটা মস্তবড় সুযোগ পায় এর ভেতর দিয়ে। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী নিজেরাই রচনা করে। তারপর যার হাতের লেখা ভালো তার ওপর ভার পড়ে কাগজটি নকল করবার। ফলে অতি সহজেই তার হাতের লেখা মুক্তোর মতো ঝক্ঝকে হয়ে ওঠে। এ ছাড়া যারা ছবি আঁকে, ফটো তোলে কিংবা আলপনা আঁকে তারাও এই হাতে-লেখা কাগজে নিজ-নিজ গুণপণা দেখাবার সুযোগ পায়। এইখানেই কিন্তু সব কাজ শেষ হয়ে গেল না। কাগজটি বাঁধাই করতে হবে। এই সুযোগে নিজেদের হাতে বই বাঁধাই করবার কাজটাও শিখে নিল ছেলে-মেয়েরা। পরে নিজেদের

পাঠ্য-পুস্তক বাঁধাই করতে আর দপ্তরীর দরজায় ধর্ণা দিতে হবে না।

অনেক সময় ছোটদের কাজ দেখে বড়দেরও অনেক শিক্ষা হয়। ছোট একটি গল্প বলছি। তখন সবে পাকিস্তান হয়েছে। নদী-মাতৃক পূর্ব্ব-পাকিস্তান থেকে হঠাৎ আমন্ত্রণ এলো ছোটদের আসরের একটি বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতে হবে। খুশী মনেই গেলাম সেখানে। জায়গাটা রবীন্দ্রনাথের শিলাইদার খুব কাছে। সেখানে গিয়ে সব চাইতে অবাক হলাম ছোটদের তৈরী ঘূর্ণায়মান মঞ্চ—যাকে Revolving Stage বলা হয়—তাই দেখে।

আমাদের দেশে একমাত্র কল্‌কাতা ছাড়া আর কোথায়ও এই জাতীয় মঞ্চ দেখিনি। তাই ছেলেদের জিজ্ঞেস্ করলাম কি করে ওরা এটা তৈরী করলে। একটি ছেলে এগিয়ে এসে বল্লে, যুদ্ধের সময় একটি আমেরিকান বিমান নদীর চরে ভেঙে পড়ে। আশে-পাশের লোকেরা যে যা পারে খুলে নিয়ে চলে যায়। প্রপেলারটা শুধু বালির মধ্যে বসে গিয়ে ধুক্‌তে থাকে। এই ছেলের দল রোজ নৌকো করে ওই চরের পাশ দিয়ে বেড়াতে যেত। নানারকম ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি খেলে এমন একটি ছেলে এই দলে ছিল। তারই পরামর্শে সবাই মিলে একটা মহাজনী নৌকো ভাড়া করে প্রপেলারটি আসরে নিয়ে আসে। ছোটদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে ওরই ওপর গড়ে ওঠে এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। সমস্ত কাঠের কাজই তারা নিজ হাতে করেছে। দেখে ছোটদের সাধুবাদ না দিয়ে পারিনি।

শিশু-সাহিত্য যাঁরা রচনা করবেন—প্রাত্যহিক জীবনে তাঁদের

ছোটদের সঙ্গে মিশ্‌তে হবে; জেনে নিতে হবে তাদের মনের খরব আর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। তবেই সে সাহিত্য সার্থক হয়ে উঠ্‌বে।

মাঝে মাঝে ছোটদের নিয়ে আসর বসিয়ে তাদের কাছে গল্প বল্‌তে হবে। আজ হঠাৎ মনে পড়ছে ভুলে-যাওয়া ১৩৩৫ সালের কথা। আমরা তখন 'মাস পয়লা' কাগজের মাধ্যমে ছোটদের একটি গল্পের আসর বসিয়েছিলাম। অবনীন্দ্রনাথকে আহ্বান করে এনেছিলাম ছোটদের কাছে গল্প বল্‌বার জন্যে। অবনীন্দ্রনাথ আমাদের মাঝখানে আজ আর নেই, সে 'মাস পয়লা' কাগজ উঠে গেছে, কিন্তু সেই সময়কার সুখময়-স্মৃতি আজও মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে আছে।

আর একটি কথা বিশেষ করে উল্লেখ করবার আছে—সেটি হচ্ছে নিয়মানুবর্ত্তিতা। আজ আমরা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মস্থান কটকে এসে উপস্থিত হয়েছি—তাই আপনা থেকেই তাঁর কথা মনে জাগে।

নেতাজী যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, একবার বলেছিলেন—গোটা ভারতবর্ষটা যদি কেউ আমার হাতে তুলে দেয় তবে মিলিটারী ট্রেনিং দিয়ে তরুণদের নিয়মানুবর্ত্তিতার পথে নিয়ে যেতে পাঁচ বছরের বেশী সময় লাগ্‌বার কথা নয়।

আজকালকার ছেলেদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ শোনা যায়—ওরা নকল করে পরীক্ষায় পাশ করবার চেষ্টা করে, অভিভাবকদের কথা শোনে না, মাষ্টারদের মারবার ষড়যন্ত্র করে—এমনি নানান্ কথা। কিন্তু একান্ত বন্ধুভাবে ওদের সঙ্গে মিশ্‌তে পারলে সব

কিছু দোষ-ত্রুটি খুব অল্পদিনের মধ্যেই শুধরে দেয়া যায় এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌ছি।

এ ব্যাপারে মণিমেলা ও সব পেয়েছির আসর প্রভৃতি কিশোর-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছে। এ সম্পর্কে একটি মজার গল্প বলি। একদিন যুগান্তর কার্য্যালয়ে বসে আছি—সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ লাঠি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে হাজির হলেন আমার কামরায়। তিনি জানালেন, সুদূর বারাণসী ধাম থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। জরুরী পরামর্শ আছে। আমি তাঁকে আসন গ্রহণ করে বক্তব্য বল্‌তে অনুরোধ জানালাম। বৃদ্ধ বল্লেন, দেখ স্বপনবুড়ো, আমার একটি নাতি আছে। কোনো কিছুরই অভাব নেই তার, তবু ইস্কুল থেকে সহপাঠীদের পেন্সিল, ছুরি, বই ইত্যাদি চুরি করে নিয়ে আসে। কি করে ওর এই রোগ সারানো যায় বলত ভাই? সত্যি কথা বল্‌তে কি বাড়ীতে ওর ছবির বই, খেলনা, পেন্সিল, নানা রকম উপহার—কিছুরই অভাব নেই।

উত্তরে আমি জানালুম, দেখুন, আপনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আমি অতি সাধারণ কর্ম্মী। তবু আমার একটি নিজস্ব পরিকল্পনা আছে, এই ব্যাপারে আপনি পরীক্ষা করে দেখ্‌তে পারেন। আপনার নাতিটিকে কখনো একলা থাকৃতে দেবেন না। একদল উৎসাহী আমোদপ্রিয় ভালো ছেলেকে ওর সঙ্গী করে দিন। ওদের সঙ্গে ছুটোছুটি করুক, বনভোজন করুক, চাই কি ভালো ছবি দেখ্‌তে পাঠিয়ে দিন ওকে। দল বেঁধে সাঁতার কাটুক, খেলা-ধুলা করুক, দু'দিনে ওই বদ অভ্যাস বেমালুম ভুলে যাবে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এইভাবে দাওয়াই দিয়ে সফলকাম হয়েছিলেন কি না আমার জানা নেই। কেননা তাঁর কাছ থেকে আমি আর চিঠি পাইনি। তবে ভরসা করি তাঁর নাতিটি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছে।

বিদেশী ছেলেদের মতো আমাদের দেশের ছেলেদেরও যদি বাধ্যতামূলকভাবে মিলিটারি ট্রেনিং দেয়া হয় তবে সুফল পাওয়া যাবে বলেই আমার ধারণা। ছোটদের সবাইকার একই রকম পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়মানুবর্ত্তিতার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করে।

আমরা যে যুগে জন্মেছি—তাতে শিশুদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের পরিকল্পনা না করে যদি আমরা শুধু শিশু-সাহিত্য নিয়ে মস্‌গুল হয়ে থাকি তবে তা অন্ধের হাতি দেখার মতোই হাস্যকর ব্যাপার হবে।

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে সবাইকে আমরা আহ্বান জানিয়ে বল্‌বো, শিক্ষকদল, যারা ছোটদের শিক্ষার কাজে ধূপের মতো নিজেদের পুড়িয়ে দিচ্ছ তারা এগিয়ে এসো, ছোটদের জন্যে যারা গ্রন্থ রচনা করছ তারা চলে এসো, যারা ছেলেমেয়েদের ব্যায়াম আর খেলাধূলা শিক্ষা দিয়ে জগতে বেঁচে থাক্‌বার মতো শরীর গঠনে আত্মনিয়োগ করেছ তারা এগিয়ে এসো, যে সব শিল্পী শিশু ও কিশোরদের জন্যে মনভোলানো ছবি আঁক্‌ছ তারা এগিয়ে এসো রঙ্‌ আর তুলি নিয়ে, অভিভাবক, অভিভাবিকার দল, মায়েরা, বোনেরা সবাই এসে জ্ঞানের-প্রদীপ জ্বালিয়ে আমাদের এই মহাব্রত উদ্‌যাপনে সহায় হও। সবাইকার শেষে আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাছে আবেদন জানাবো—শিশুকল্যাণের সকল উপচার মনোমত করে সাজিয়ে দেবার জন্যে। কেননা

শিশুদের যদি আমরা হারাই তবে দেশ যে আমাদের রসাতলে যাবে !

কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে—কি তুমি চাও, কি তোমার কামনা ? তবে আমি আহ্বান জানাবো এমন এক ভারতভূমির জন্যে —যেখানে শিশু ও কিশোরদল অশিক্ষায় আর অস্বাস্থ্যে অন্ধকারের কূপে নিমজ্জিত থাক্‌বে না। কোল খালি করে কোনো মা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করবে না। সেখানে সবাই পেটপুরে খেতে পারবে, মন খুলে হাস্‌তে পারবে, প্রাণে-প্রাণে জ্বলে উঠ্‌বে জ্ঞানের প্রদীপ, শিশুমৃত্যু এ দেশ থেকে চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে আর সৌন্দর্য্যে সবাই ঝল্‌মল্‌ করে উঠ্‌বে—রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার সেই "সব পেয়েছির দেশে" নতুন করে বসাবো আসর। সেই ফোটা-ফুলের বাগানে শোনাবো—নতুন দিনের নতুন গান, নতুন ছড়া—আর নতুন কাহিনী।

জয় হিন্দ্ *

---

* কটকে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ রূপে পঠিত।

ছোটদের আনন্দ-আসর

কিশোর রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলাটা বড় একলা কেটেছে। তিনি খুব বড়লোকের ছেলে ছিলেন বটে, কিন্তু ওই বয়সে খেলার সাথী তাঁর আদপেই ছিল না। চাকরদের চোখ-রাঙানি আর তাদের দেয়া গণ্ডীর মধ্যে তাঁর কৈশোরের দিনগুলি কাটত। আজকের দিনে তোমাদের মধ্যে এমন একটি ছেলেকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যার জামার মধ্যে একটি পকেট নেই। ছেলেবেলায় একটি পকেটের জন্য কিশোর রবির ক্ষোভের আর দুঃখের অন্ত ছিল না।

কিশোর রবির দাদারা এক সময় দল বেঁধে একটি নাটকের মহলা দিচ্ছিলেন। দরজা-জান্‌লা বন্ধ করা একটি ঘরের ভেতর থেকে একটি গানের কলি ভেসে এসে এই ছোট্ট কবিকে ভারী উতলা করে তুল্‌ত। কিন্তু সেই ঘরের মধ্যে ঢোক্‌বার হুকুম ত' কিশোর রবির ছিল না; তাই কান পেতে সেই গানের কলিটি শুনতো আর তাঁর খাঁচায়-বন্ধ মন উন্মনা হয়ে নীল আকাশে উধাও হয়ে যেতে চাইত।

সেই গানের অংশটি ছিল এই ঃ

"—ও কথা আর বোলো না—আর বোলো না—
বল্‌ছ বঁধু কিসের ঝোঁকে ?

ও বড় হাসির কথা—হাসির কথা—
হাস্‌বে লোকে—
হা—হা—হা—হাস্‌বে লোকে।”

কী সে হাসির কথা যা শুনলে লোকে হাস্‌বে…সেই গোপন তথ্যটি শিশু রবি আর জান্‌তে পারে নি! সেই বয়সে কেবলি তার মনে হত—একটি আনন্দের উৎস তার কাছে থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে …আর বড়র দল ছোটদের বঞ্চিত করে সেই পুলকে ক্রমাগত অবগাহন করছে!

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় যে ব্যাপারটি ঘট্‌ত তোমাদের ছোট বয়সে তার যে কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটেছে চারিদিকের আবহাওয়া দেখে এমন কথা জোর গলায় বলা চলে না!

যারা অভিভাবকের বাধ্য ছেলে—তাদের অবস্থা ত' এই! আবার এক দল দুষ্ট, বিচ্ছু ছেলে আছে তাদের কথা বল্‌ছি। এই বিচ্ছু ছেলের দল ইস্কুল পালিয়ে কিম্বা ছুঁতো করে একটা ধর্ম্মঘট বাঁধিয়ে, বই-খাতা-পত্তর নিয়ে বিদ্যালয়ের বাইরে চলে আসে, আর তার কিছুক্ষণ বাদেই তাদের দেখা যায় সিনেমার ম্যাটিনী শোর লাইনে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে!

এই ব্যাপারে শুধু ছোটদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা মনোমত আমোদ-প্রমোদে মাতলে বড়দের কর্ত্তব্য শেষ হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় বসে ভেবে দেখতে হবে—কোথায় আসল ব্যাধি এবং কি তার প্রকৃত প্রতিকার।

কোনো একটা ছুটির দিনে যদি তুমি অনেকক্ষণ ধরে অঙ্ক কসো কিম্বা বদ্ধ-ঘরে বসে গ্রামার মুখস্ত করো—ত' দেখবে বিকেলের

দিকে মাথাটা ঝিম্-ঝিম্ করছে···অথবা বেশ ধরেছে। তখন দেহ আর মন চায় খোলা হাওয়ায় বেড়াতে।

তেমনি সারা সপ্তাহ ধরে যে সব ছেলেমেয়ে ফাঁকি না দিয়ে সত্যি লেখাপড়া করে তাদের মনের খোরাক হিসাবে আনন্দ-উৎসবের প্রয়োজন আছে। নইলে জীবনটা বড় একঘেয়ে হয়ে ওঠে, পড়াশুনায় তেমন আর মন লাগ্তে চায় না।

স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়েদের গল্প তোমরা শুনে থাক্বে। তারা সারা সপ্তাহ নিষ্ঠার সঙ্গে ইস্কুলের পড়া শেষ করে সপ্তাহান্তে (Week-end) দল বেঁধে একটা জায়গায় বেড়াতে যায়। সেখানে বন-ভোজন, অভিনয়, কিম্বা দেশ-ভ্রমণের ভেতর দিয়ে যে শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করে, তাতে পরবর্ত্তী সপ্তাহে আরো অধিক মনোযোগের সঙ্গে পাঠ্য-পুঁথির দিকে দৃষ্টি দেয়। মানুষের মন চায় বৈচিত্র্য। তাই বড়দের হোক, ছোটদের হোক ক্রমাগত কাজ করতে বল্লে একঘেয়েমী এসে পড়ে। এই ভাবকে কাটিয়ে তুল্তে গেলে আমোদ-প্রমোদের একান্ত প্রয়োজন।

ছোটদের মধ্যে কি ভাবে আনন্দ পরিবেশন করা চলে আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্দের বহুকাল আগে থেকেই সে সম্পর্কে চিন্তা করা প্রয়োজন ছিল।

সম্প্রতি ভারত সরকার স্থির করেছেন, ভবিষ্যতে বিচার বিবেচনা না করে বয়স্কদের উপযুক্ত ছবি দেশের ছোট ছেলেমেয়েদের দেখতে দেয়া হবে না। এজন্য প্রত্যেক ছবির ওপর একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন থাকবে। 'R' লেখা ছবিগুলি থাক্বে সীমাবদ্ধ (Restricted) ;

সে ছবি কেবলমাত্র বয়স্করা দেখতে পারবেন। 'U' ছবি হবে 'Universal', ছেলে-বুড়ো সবাই দেখতে পারবেন।

তোমাদের জন্যে বিশেষ ভাবে পরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে আনন্দ-উৎসবের যে প্রয়োজন আছে সেকথা আজকের দিনে অস্বীকার করবার যো নেই এবং সেই ব্যবস্থা করতে আমরা যত বেশী দেরী করবো ততই আমাদের দেশের ভাই-বোনদের ভুল পথে ঠেলে দেয়া হবে।

রবীন্দ্রনাথ ও শিশুর দল

২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাঝখানে এসেছিলেন এবং সেই স্মরণীয় দিনটিকে ভিত্তি করে তোমরা প্রতি বছর আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করে থাকো। শিশু-রবি ছোটবেলায় সঙ্গীহীন হয়ে আনন্দোৎসবের অভাবে ঘরের কোণে, ছাতের আল্‌শের পাশে কিম্বা পুকুরের জলে বট গাছের ছায়া দেখে সময় কাটাতেন। বড় হয়ে তিনি ছোটদের মনের ব্যথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই জন্যে তিনি ছোটদের অভিনয় করবার মতো কয়েকটি সুন্দর নাটক তোমাদের উপহার দিয়ে গেছেন।

বড় হয়েও বাল্যের নির্জ্জন দিনের সঙ্গী বটগাছটিকে তিনি ভুলতে পারেন নি! তাই পরিণত বয়সে তাকে ছোটবেলাকার বন্ধু হিসেবে প্রশ্ন করেছেন :

"নিশিদিন দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,—
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে ওগো প্রাচীন বট?"

মানুষ বড় হয়েই ছোটবেলাকার মনের ব্যথা ভুলে যায়। কিন্তু কিশোর রবি বিশ্বকবি হয়েও তোমাদের ভুলতে পারেন নি বলেই ছোটদের আনন্দ-আসর বসাবার প্রচুর খোরাক রেখে গেছেন। "অচলায়তন" নাটকটিতে ত কবি নিজের ছেলেবেলাকার গণ্ডীর কথা কৌশলে বলে গেছেন। চারিদিকে শুধু নিষেধের প্রাচীর। সেই বেড়া কি করে ভেঙ্গে ফেল্‌তে হবে কবি তার সন্ধান দিয়েছেন। তোমরা যদি নাটকটি পড়ো আর অভিনয় করো তবে আনন্দের সঙ্গে প্রচুর জ্ঞানও তোমাদের হবে। "মুকুট" নাটকটি অভিনয় করেও তোমরা নিজেরা শিক্ষা পেতে পারো আর সেই সঙ্গে বড়দের মনেও খুশীর হাওয়া বইয়ে দিতে পারো। কবির লেখা আর একটি কিশোর নাট্য হচ্ছে "ডাকঘর"। একটি ছোট ছেলেকে মিছিমিছি অসুখ হয়েছে বলে যদি ঘরে আটক রাখা হয়, তবে তার মনের অবস্থা কেমন হয়ে ওঠে তোমরা অতি সহজেই অনুমান করে নিতে পারো। অমলের অবস্থাও ঠিক সেই রকম হয়েছিল। এই 'ডাকঘরে'ও কবি ছেলেবেলাকার আনন্দহীন বদ্ধ জীবনের কথা বলে গিয়েছেন। তারপর স্বয়ং জীবন-দেবতা কি ভাবে অমলকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দিয়ে অসীম মুক্তির পথ দেখিয়ে দিলেন তাই নাটকটিকে বলা হয়েছে। এই নাটকের শেষ গানটি রচনা করে কবি বলেছিলেন, গানটি যেন তার মৃত্যুর পর গাওয়া হয়! সেই গানটি কি তোমরা জানো? গানটির প্রথম লাইন হচ্ছেঃ

"সমুখে শান্তি পারাবার—ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।"

এই "ডাকঘর" যখন প্রথম অভিনীত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ,

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করে নাটকের বিভিন্ন চরিত্র অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

"ডাকঘর" পৃথিবীর বহু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং বার্লিন বেতারেও অভিনীত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তখন বেঁচে ছিলেন—সেই সময়কার একটি ঘটনার কথা বল্‌ছি। কবির জন্মদিন উপলক্ষে বাঙ্‌লা দেশের শিশু-সাহিত্যিকগণ স্থির করলেন, "ডাকঘর" অভিনয় করা হবে। সেই নাটক কল্‌কাতার "ফার্ষ্ট এম্পায়ারে" অভিনীত হল এবং বেতার কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় একই সঙ্গে সবাইকে রীলে করে শোনানো হল। এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন—কবি গিরিজাকুমার বসু, নাট্যকার মন্মথ রায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, সুনির্ম্মল বসু, অখিল নিয়োগী, বিমল ঘোষ, প্রভাতকিরণ বসু, নির্ম্মল চৌধুরী, ইন্দিরা দেবীর ছোট বোন বাণী এবং আরো অনেকে। শান্তি নিকেতনে বসে কবি এই নাটক বেতার যোগে শুনে এত খুশী হয়েছিলেন যে, শিশু-সাহিত্যিকদের আশীর্ব্বাদ করে কবি গিরিজাকুমার বসুর কাছে চিঠি লিখেছিলেন।

তোমরা যদি রবীন্দ্রনাথের লেখা বিসর্জ্জন, ডাকঘর, বাল্মীকি-প্রতিভা এবং হাস্য-কৌতুক ও ব্যঙ্গ-কৌতুকের নাটিকাগুলি অভিনয় করো ত' আমোদ ও শিক্ষা এক সঙ্গে দুইই পেতে পারো।



নাটমঞ্চ

নববর্ষ

[মঞ্চ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মাঝে হাত ধরাধরি করে ঢুকলো একটি খোকা আর একটি খুকু]

খুকু ॥ আচ্ছা দাদা, এত অন্ধকার কেন ? এত আঁধারের ভিতর দিয়ে বুঝি পথ চলা যায় ?

খোকা ॥ ভয় কি রে খুকি! আঁধার কেটে যাবে···তারপর আমরা নববর্ষ উৎসব করবো।

খুকু ॥ নববর্ষ কখন আসবে দাদা ? সে কি দেখতে খুব বুড়ো ?

খোকা ॥ মোটেই না···সে নতুন, আসবে আমাদের মাঝখানে ···আমাদের খেলার সাথী হবে সে। আজই ত সে আমাদের সঙ্গে ভাব করে নেবে। সোনার মতো তার গায়ের রঙ্। আমাদের সঙ্গে হাসবে···খেলবে···গাইবে···ছায়ার মতো একটা বছর সে আমাদের সাথে সাথে ফিরবে।

খুকু ॥ তার সঙ্গে আমাদের ভাব না আড়ি ?

খোকা ॥ ভাব রে···ভাব। আড়ি কেন দিতে যাবো ?

খুকু ॥ বাঃ-রে! তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না দাদা ! আগের বছর যে খেলার সাথী আমাদের সঙ্গে খেলতে এলো···ভারী দুষ্টু সে। আমার খেলাঘরের খেল্‌না ভেঙে খান্‌-খান্‌ করে দিয়েছে।

সকলের সঙ্গে ঝগড়া আর মারামারি ত লেগেই আছে। ওই রকম দস্যি খেলার-সাথী হলে কিন্তু আমি কিছুতেই তার সঙ্গে ভাব জমাবো না। একথা আমি আগে থাকতেই বলে রাখছি—

[একটি বুড়োর খক্‌খক্ কাশি শোনা গেল। বুড়োর প্রবেশ]

বুড়ো ॥ আর আমার সঙ্গে ভাব জমাতে হবে না—আমি চললাম, এইবার আমার ছুটি।

খুকু ॥ তুমি আবার কে ? কোত্থেকে এলে ? তোমায় ত আমরা চিনিনে।

পুরোনো বছর ॥ বা-রে খুকি ! এরই মধ্যে আমায় ভুলে গেলে! আমি যে পুরোনো বছর। আমার মেয়াদ ফুরিয়েছে…এইবার আমি চললাম—

খোকা ॥ এক বছরের মধ্যে তুমি এত বুড়ো হয়ে গেছ ?

খুকু ॥ যখন এলে…একেবারে সোনার বরণ রাজপুত্তুর ছিলে।

পুরোনো বছর ॥ তাই ত হয় খুকু ! এক বছরই যে আমাদের পরমায়ু। তাই ত এই শেষ-রাত্তিরের আঁধারে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে এলাম—অনেক ঝগড়া-ঝাঁটি মারামারি করেছি তোমাদের সঙ্গে। কিন্তু তোমরা ভাই-বোন খুশীমনে যদি আমায় বিদায় না দাও ত প্রাণে বড় ব্যথা পাবো।

খুকু ॥ সত্যি ! এখন তোমার জন্যে আমাদের কষ্ট হচ্ছে। একটা বছর ত আমরা খেলাঘর সাজিয়েছিলাম, সুখে-দুখে যাহোক আমাদের খেলাঘর ত বন্ধ হয়নি। কতবার তোমার সঙ্গে আড়ি দিয়েছি…কতবার ভাব জমিয়েছি—

পুরোনো বছর ॥ কিন্তু এইবার একেবারে ছুটি চাই…আর আমি দাঁড়াতে পারবো না খোকা-খুকু! এই আঁধার পথেই আমাকে পালাতে হবে।

—পুরোনো বছরের ছড়া—

মলাট-ছেঁড়া পুঁথির মতো 'গত বছর' যায়,
খোকা-খুকুর খেলাঘরে ঠাঁই দেবে না হায়!
তাই ত পালাই আঁধার পথে,
নূতন বরষ আসছে রথে—
জীর্ণ-পাতা ঝরে গেলেই সবুজ পাতা চায়।

[পুরোনো বছরের প্রস্থান]

খোকা ॥ আরে—আরে—আরে। পাখার ঝাপট্ মারে মাথার ওপর ও কে!

বাদুড় ॥ হুঁ! হুঁ! আমায় চেন না? আমি হচ্ছি রক্তচোষা বাদুড়। যে বনে আমি থাকি, সেখানে সুখ নেই, শান্তি নেই; গাছে ফুল ফোটে না, ফল ধরে না, খালি হাহাকার আর নেই—নেই।

খুকু ॥ তা হলে ত বাছা তুমি লোক ভালো নও।

বাদুড় ॥ হুঁ! হুঁ! আমার আরো গুণ আছে। যেখানে থাকি, আমার এই কালো পাখা দিয়ে মানুষের চলার পথ ঢেকে রাখি… তাই সে দেশের লোক যুগ-যুগ ধরে পরের অধীন হয়ে থাকে।

খোকা ॥ তা হলে এখন তুমি চলে যাচ্ছ কেন?

বাদুড় ॥ তোমরা এখন তোমাদের দেশের ভার নিজেদের হাতেই নিয়েছ। তাই ত আমার আর এখানে থাকবার যো নেই। আঁধার

থাকতে থাকতেই আমায় পালাতে হবে। তাই পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

—বাদুড়ের ছড়া—

শুষে নিই ফুল-ফল, শুষে নিই শান্তি,—
আমার পরশে মনে জাগে শুধু ভ্রান্তি।
কালো পথে আনাগোনা
মিথ্যারি জাল বোনা,
আজ বুঝে নিতে চায় কড়া আর ক্রান্তি !

কালো মোর পাখা দিয়ে পথিকের ঢাকি পথ,
অন্যায় অনিয়মে গড়ি মোর মনোরথ।
ভারতের শিশুদল
আজ করে কোলাহল…
অমানিশা কেটে যায়, আর তোরে স্থান দি ?

[বাদুড়ের ছুটে পলায়ন]

খুকু ॥ তাই ত ! রক্তচোষা বাদুড়টা সত্যি পালিয়ে গেল দাদা !
খোকা ॥ এইবার বুঝি নববর্ষের ভোর হবে—

[কুহুকুহু গাইতে গাইতে কোকিলের প্রবেশ]

কুহু কুহু গান গেয়ে যাই
আনন্দেরি ঝরণা ঝরাই,
মরুভূমে ফুল যে ফোটাই
আমি কোকিল—

পড়লো সাড়া শিশুর দলে,
ঘুম ভেঙে যায় কৌতূহলে
সার বেঁধে সব এগিয়ে চলে—
বিরাট মিছিল।
বসন্তেরি দূত যে আমি…
গান গেয়ে যাই দিবস-যামি,
আমি যে ভাই মুক্তি-কামী
সবায় ডাকি—
নতুন করে লাগলো জোয়ার,
নাই পরাণে শঙ্কা ত আর—
আজ মিতালীর সবাই সোয়ার
পরায় রাখি!

খুকু॥ বাঃ—বাঃ—বাঃ! সুন্দর গাইছে ত বসন্তের কোকিল। তুমি কোন্ দেশে চলেছে ভাই?

কোকিল॥ চলেছি নয়…আমি এলাম তোমাদেরই দলে। গান গেয়ে গেয়ে সবাইকে আমি জাগাবো। সেই ত আমার কাজ। তোমরা দেখছি ভোর না হতেই উঠেছ। যাদের চোখ থেকে এখনো ঘুমের ঘোর কাটেনি আমি তাদেরই জাগাতে চললাম—

[গাইতে গাইতে দূর আকাশে চলে গেল]

খোকা॥ একি রে খুকু! দিব্যি পুবদিকের আকাশটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল…আমি ভাবলাম এইবার সূর্য্যি-মামা উঁকি দেবে… তবেই ত নববর্ষের রথ পথ খুঁজে পাবে।

[কালো মেঘের প্রবেশ]

কালো মেঘ॥ ভয় নেই খোকা-খুকু! আমি কালো মেঘ। আমিই ত এদ্দিন স্বাধীনতা-সূর্য্যের সহজ পথ আটকে রেখেছিলাম। তোমাদের সূর্য্যি-মামার তেজ আর আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। তাই ত পালিয়ে যাচ্ছি। এইবার তোমাদের সোনালী সূর্য্য দেখা দেবে—

—কালো মেঘের ছড়া—

আমি ভাই কালো মেঘ ঢেকে রাখি অরুণে…
তবু জেনো মনে মনে ভয় করি তরুণে!
বিদ্যুৎ চমকায়
সবে করে হায় হায়,
আমি খুঁজি পীড়নের বাণ কি কি ও তূণে।

অরুণ-কিরণে আজি বাণ মোর খান খান…
খোকা-খুকু গাও গান
পাবে প্রাণ অফুরাণ,
নবারুণ ওঠে ওই—ভয় কি গো বরুণে!

[কালো মেঘ ভেসে চলে গেল]

খুকু॥ দেখেছ দাদা…সূর্য্যি-মামার সাত ঘোড়ার রথ? আকাশ পথ বেয়ে এই দিকেই আসছে।

খোকা॥ আর তারই পেছন পেছন আসছে নববর্ষের সোনালী রথ। শান্তির পতাকা উড়ছে রথের শিরে…আলোর মালা দুলছে চারদিকে…কান পেতে শোন নববর্ষের শঙ্খধ্বনি—

স্বপনবুড়োর ঝুলি

—নববর্ষের ছড়া—

আমি যে ভাই নতুন বছর
আমি তোদের খেলার সাথী,
ছয় ঋতুতে তোদের তরেই
মিতালীরই মালা গাঁথি।
প্রীতির রসে অর্ঘ্য সাজাই···
বন-বিহগের বন্দনা গাই—
বায় ডেকে ভাব যে জমাই
শিশুর দলেই মাতামাতি,
আমি তোদের খেলার সাথী।

ফুলের মুখে মধুর হাসি
নদীর বুকে জাগাই ধ্বনি,
পাহাড়-শিরে পতাকা মোর—
সাগর-বেলায় প্রহর গণি।
আয় না যত পথভোলা দল···
অকারণেই বাজাই মাদল—
ভাব জমাবার গানখানি ভাই
গাইবো মোরা দিবস-রাতি···
আমি তোদের খেলার সাথী।

যবনিকা

ভাই-বোন

[একাঙ্ক নাটিকা]

[অন্ধকার সবে ঘনিয়ে এসেছে, একটা সহরের রাজপথ আর একটি বাড়ীর অংশ মঞ্চের এক কোণে দেখা যাচ্ছে। দোতলার জানলায় একটি ছেলে অরে একটি মেয়েকে দেখা গেল]

ভাই ॥ জানিস মিলি, আজ নষ্টচন্দ্র…

বোন ॥ অ্যা ! নষ্টচন্দ্র ! চাঁদটা নষ্ট হয়ে প'চে গেছে বুঝি ? আকাশ থেকে খ'সে পড়বে ? বল না দাদা !

ভাই ॥ তুই একেবারে বোকা মিলি ! এখনো বুদ্ধি-শুদ্ধি কিচ্ছু হয় নি।

বোন ॥ কবে বুদ্ধিশুদ্ধি হবে—বল না দাদা !

ভাই ॥ [বিজ্ঞের মতো] এক কাজ করতে পারিস্ ? বুদ্ধির বীচি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। খেলেই বুদ্ধির গাছ গজিয়ে যাবে তোর পেটে। তখন কত বুদ্ধি তোর মগজ থেকে বেরুবে।

বোন ॥ ও ! তুমি ঠাট্টা করছ ! সে আমি বুঝতে পেরেছি।

ভাই ॥ কে বলে আমার মিলু বোনের বুদ্ধি নেই ! এই ত' কত বুদ্ধি গজিয়েছে !

বোন॥ এইবার বলো না, নষ্টচন্দ্র কাকে বলে!

ভাই॥ নষ্টচন্দ্র! অন্যদিন যদি আমরা দুষ্টুমী করি তবে জ্যাঠা-মশাই, কাকাবাবু সেজদা সবাই এসে আমাদের কান পাক্‌ড়ে ধরবে। কিন্তু নষ্ট চন্দ্রের দিন দুষ্টুমী করলে সাতখুন মাপ! কেউ কিচ্ছু বল্‌বে না।

বোন॥ [হাততালি দিয়ে] কি মজা! কি মজা! আমি এক্ষুনি চাঁপা সইয়ের পুতুলটা নিয়ে আসি—

ভাই॥ দূর বোকা! পুতুল নিয়ে কি হবে? দেখ্‌ না আজ কি কাণ্ড করি। ওই দেখ, পেয়ারা নিয়ে হাঁক্‌তে হাঁকতে একজন ফিরিওলা এই দিকেই আস্‌ছে।

বোন॥ তাতে কি হবে দাদা?

ভাই॥ আমার হাতের এই বঁড়শী-বাঁধা সুতো দেখেছিস?

বোন॥ দেখ্‌ছি তো। ও দিয়ে ত মাছ ধরে।

ভাই॥ কিন্তু আজ আমি পেয়ারা তুলবো।···চুপ্‌···

[হাঁক্‌তে হাঁক্‌তে পেয়ারাওয়ালার প্রবেশ]

পেয়ারাওয়ালা॥ চাই পেয়ারা! কাশীর টাট্‌কা পেয়ারা···ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না।

ভাই॥ [চুপি চুপি] ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আমি টুক্‌ করে কুড়িয়ে নেবো।

বোন॥ কিন্তু দাদা, পেয়ারাওলা যদি টের পায়?

ভাই॥ দূর বোকা! টের পাবে কি করে? দেখ্‌না আমার হাতের কসরৎটা!

[বঁড়শী ঝুলিয়ে দিয়ে পেয়ারা তুলে নিলে]

বোন ॥ [হাততালি দিয়ে] কি মজা ! কি মজা !

পেয়ারাওয়ালা। অ্যাঁ ? কে কথা কইলে ?

[ওপরের দিকে তাকালো। ভাইবোন ততক্ষণে
সুড়ুৎ করে স'রে পড়েছে।]

পেয়ারাওয়ালা ॥ নাঃ, কেউ নেই ! চাই পেয়ারা ! কাশীর ভালো পেয়ারা··· [প্রস্থান]

[জানালায় ভাই-বোনকে দেখা গেল]

ভাই ॥ দেখ্‌লি মজা !

বোন ॥ তুমি ত' বেশ তাক্ করতে পারো দাদা ! ইচ্ছে করলে তুমি তীর ছুঁড়তেও পারো ?

ভাই ॥ নিশ্চয় পারি। অর্জ্জুন ত' তীর ছুঁড়েই যুদ্ধ করত। বড় হলে আমি খুব নাম-করা বীর হবো।

[দূর থেকে হাঁক শোনা গেল— কম্‌লা—সিলেটের
মিষ্টি কম্‌লা]

বোন ॥ দাদা, ওই দেখ, কমলাওলা এই দিকেই আস্‌ছে। তুমি বঁড়শী দিয়ে কমলা তুলে নিতে পারবে ?

ভাই ॥ পারি কি না পারি তুই দাঁড়িয়ে থেকে দেখ্‌না—

[কমলাওয়ালা ঢুক্‌লো]

কমলাওয়ালা ॥ চাই কমলা—সিলেটের মিষ্টি কমলা—কিনে নাও এইবেলা—

[বঁড়শীতে গাঁথা হয়ে একটি কমলা ওপরে উঠে এলো]

কমলাওয়ালা॥ আরে ! আরে ! মাথার ওপর দিয়ে কি একটা উড়ে গেল না ? অন্ধকার হয়ে এসেছে কিছু ঠাহর করতে পারছি না। নাঃ, এ পাড়ায় আর বিক্রী হবে না, চলি—চাই কমলা, ভালো-মিষ্টি-টাট্‌কা—তাজা কমলা—

[প্রস্থান]

বোন॥ দাদা ! ভারী তাক্ করতে পারো ত' তুমি ! পাণ্ডবদের সময় জন্মাতে ত' নিশ্চয়ই লক্ষ্য ভেদ করে দ্রৌপদীকে নিয়ে বিয়ে করতে পারতে !

ভাই॥ যা—যা—আর জ্যাঠামো করতে হবে না—। ওই দেখ্ মর্ত্তমান কলার কাঁদি ঝুড়িতে নিয়ে একটা লোক এই দিকেই আসছে।

[কলাওয়ালা ঢুকলো]

কলাওয়ালা॥ চাই ভালো মর্ত্তমান কলা—

[কলাওয়ালার ছড়া]

মর্ত্তমান কলা রে ভাই মর্ত্তমান কলা…
পাড়ায় পাড়ায় তাই নিয়ে ভাই আমার এ পথ চলা !
খাও যদি নির্ঘাৎ
সব কাজ হবে মাৎ
উদরখানি ভর্ত্তি হবে, মিষ্টি হবে গলা !

বোন ॥ দাদা, বেশ বড় বড় কলা! এক কাঁদি যদি ঝুড়ি থেকে তুলে নিতে পারো তবে বুঝ্‌বো তোমার বাহাত্বরী।

ভাই॥ উঁহু! আর কথাটি নয়। আগে আমার বঁড়শীটা বাগিয়ে নিতে দে—

[বঁড়শী ছুঁড়ে মারল]

কলাওয়ালা॥ আরে—আরে! আমার এক কাঁদি কলা ...ভর সন্ধ্যেবেলা উড়ে পালাচ্ছে···কোন অলক্ষুণে শ্মশান ধারের গাছের কলা কে জানে···রাম—রাম—রাম—রাম!

[ছুটে পলায়ন]

ভাই॥ দেখ্‌লি পাগ্‌লি! আমার মন্তর-পড়া বঁড়শীর কি গুণ! পেয়ারা হ'ল, কমলা হ'ল, কলাও জুটে গেল।

বোন॥ দাদা, আর বোলো না, আমার জিভে জল এসে গেছে। সব ভাগ ক'রে ফেল, টপাটপ্‌ গালে পুরি···

ভাই॥ ঠিক বলেছিস। পেয়ারা, কমলা···কলা···এই নে আধা-আধি ভাগ করে দিচ্ছি···

[এক ভিখারীর প্রবেশ। পরণে ছেঁড়া কাপড়। দেখে মনে হয় ক'দিন সে খায় নি। অতি শুক্‌নো চেহারা]

ভিখারী॥ তিনদিন খাইনি বাবা। তোমরা কি খাচ্ছ? আমায় দেবে? ভগবান তোমাদের ভালো করবেন। তোমরা বড় হয়ে দেশের উপকার করবে।

বোন॥ দাদা দেখেছ? ভিখিরীটা সত্যি না খেয়ে আছে। আমাদের ত' রাত্তিরের খাবার তৈরী হচ্ছে…ওকেই ফলগুলো সব দিয়ে দাও…

ভাই॥ কে বলে তুই বোকা! একটা কাজের মতন কাজ হবে। দেখ্‌লি ত' আমার হাতের তাক্? ও ভাই, এইদিকে এসো, ফলগুলো তুমি খাও।

[ওপর থেকে কোঁচড়ে ফেলে দিলে]

ভিখারী॥ তোমরা ভাইবোন বুঝি—? ভগবান তোমাদের ভালো করবেন। কেউ আজ আমায় খেতে দেয়নি। সবাই দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। তোমরা দুটিতে আমার প্রাণ বাঁচালে। তোমাদের জয় জয়কার হোক। [প্রস্থান]

*　　*　　*　　*

[পরদিন ভোরবেলা]

ভাই॥ মিলি—মিলি—বোন—

বোন॥ দাদা ডাক্‌ছ?

ভাই॥ হ্যাঁরে! আমি কাল রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। দেখ্‌লাম···সাদা ধব্‌ধবে কাপড় প'রে বিধাতা পুরুষ আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, খোকা, কাল আমি ভিখিরী সেজে গিয়েছিলাম, তোমাদের কাছে, ভাই-বোনকে পরীক্ষা করবো ব'লে। তোমরা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য

হয়েছ। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, কেউ কোত্থাও নেই। ভোরের পাখীর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল।

বোন ॥ দাদা, ভোরের স্বপন সত্যি হয়…না দাদা ?

ভাই ॥ হ্যাঁরে, ঠাকুমা ত' তাই বলে।

[ভাই-বোন জানলার ধারে এসে দাঁড়ালো, লাল সূর্য্যের আলো তাদের মুখের ওপর এসে পড়ল]

যবনিকা

ফুল ফোটার ছন্দ

[নাটিকা]

[সন্ধ্যেবেলা : একটি ছোট্ট মেয়ে টবের পাশে চুপচাপ বসে আছে। ঝির ঝিরে হাওয়ায় একটি ফুলের কুঁড়ি হেলছে, দুল্‌ছে। মেয়েটি এক দৃষ্টে ফুলের কুঁড়িটির দিকে তাকিয়ে আছে। এমন সময় আস্তে আস্তে মেয়ের মা এসে কাছে দাঁড়ালেন। মেয়েটির কিন্তু এতটুকু হুঁস নেই। সে একই দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে]

মা ॥ কিরে কণা, সেই বিকেল থেকে চুপচাপ টবের পাশেই বসে আছিস ? জলখাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল ! তারপর পড়তে বস্‌বি নে ? এক্ষুণি মাষ্টারমশাই আসবেন যে !

কণা ॥ দেখ্‌বে এসো মা, কি মজার ব্যাপার ! আমার টবে একটি কুঁড়ি হয়েছে। কাল সকালে ফুল ফুট্‌বে।

মা ॥ তা ত' ফুট্‌বেই। সেটা আর এত হাঁ করে দেখ্‌বার কি আছে ? তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে পড়তে বোস্। একটা কুঁড়ির মধ্যে এত কি লুকিয়ে রয়েছে বুঝিনে বাপু !

কণা ॥ দেখ্‌বার নেই ? তুমি বল্‌ছ কি মা ? এই আজ সন্ধ্যে-বেলায় কুঁড়ি রয়েছে, কাল সকালে একটা ফোটা ফুল আমাদের চোখের সামনে বাতাসে দুল্‌তে থাকবে, ছড়িয়ে দেবে তার সুবাস।

কিন্তু রাত্তিরের অন্ধকারে কি ভাবে কখন ফুল ফুট্‌বে আমি দেখ্‌বো। তাই ত চুপচাপ বসে আছি টবের ধারে। আজ আমি চোখের পাতা কিছুতেই বন্ধ করছি নে। যেই ফুলটি ফুট্‌বে আমি দেখে নেবো।

মা॥ কি যে আবোল-তাবোল পাগলের মতো কথা বলিস্ তার কিছু ঠিক নেই! ফুল ফোটার মধ্যে কি আছে তা ত' কোনো দিন শুনি নি বাপু! তোর যত আজে-বাজে খেয়াল!

কণা॥ বা রে! কার খেয়ালে অন্ধকার রাত্রে সবার অজান্তে ফুল ফোটে তা দেখ্‌বো না? তখন তোমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। আকাশে চাঁদ জাগবে, আর নীচে জাগ্‌বো আমি। কিন্তু ফুল কি করে ফোটে আমি দু'চোখ মেলে দেখ্‌বো।

মা॥ (রেগে) যা খুশী করো, আমি কিছু জানি নে। তারপর যদি ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করে—ভুগ্‌তে হবে ত' আমাকেই!

কণা॥ মা রাগ করে চলে গেল···এ হল ভালো। আমি চুপি চুপি আর একা-একা! কেউ কোথাও নেই। বেশী লোক কাছাকাছি থাক্‌লে ফুল হয়ত লজ্জা পাবে··ফুট্‌তে চাইবে না! (একটু ভেবে) আমাকে ফুল ভালোবাসবে। একটুও পর ভাববে না। চোখ পিট্‌ পিট্‌ করে মেলে দেবে ওর দল। তাই ত' দু'চোখ ভরে আমি দেখ্‌বো।

(নেপথ্যে সেতারের ঝঙ্কার)

(পা টিপে টিপে চাঁদের আলোর প্রবেশ)

চাঁদের আলো॥ এ কি! খুকু এখনো ঘুমোয় নি! ফুল ফোটার যে সময় হয়ে গেল! এখন উপায়?

দখিণ হাওয়া॥ তাই ত' আমিও ভাবছি। কিন্তু খুকুর চোখে ঘুম নেই। ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসির আজ হল কি?

চাঁদের আলো॥ হবে আবার কি? হয় ত বাপের বাড়ী চলেছে দুজনে।

দখিণ হাওয়া॥ তা হলে এখন উপায়? খুকু না ঘুমুলে ত' ত' আমরা ফুল ফোটাতে পারবো না।

চাঁদের আলো॥ আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? তুমি ত' খুব তাড়াতাড়ি ছুট্‌তে পারো, ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে ডেকে আন্‌তে পারো না?

দখিণ হাওয়া॥ সে হয়ত পারি। তা হলে তুমি ততক্ষণ খুকুকে যতটা পারো ভুলিয়ে রাখো।

দখিণ হাওয়ার গান

যতদূর চোখ যায়—চলি ফুর্ ফুর্!
মাসি পিসি আছে যেথা পাহাড়ের পুর।
বাটা ভরা পান নিয়ে
মাসি পিসি মিশি দিয়ে
মেঘের ভেলায় চড়ে আসে তুর্ তুর্॥

মাসি-পিসি নিজে আজ ঘুম-কাতুরে
বাপের বাড়ীতে দেখি বড় আদুরে।

নিয়ে আয় খিলি পান,
মিঠে সুরে শোনা গান
না যদি আসিস্ তবে চলে যা রে দূর॥

(দখিণ হাওয়া দূরে চলে গেল)

চাঁদের আলো॥ যতক্ষণ দখিণ হাওয়া ফিরে না আসে আমাকেই ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কণা যে ভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে—ও দস্যি মেয়ে যে ঘুমুবে তা ত' বোঝা যাচ্ছে না! আমার মিঠে রূপেলী আলোতে ওর কোঁক্‌ড়া চুলগুলি চমৎকার দেখাচ্ছে। আচ্ছা, কি করলে ওর ঘুম আস্‌বে? ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি যদি না আসে তা হলে ত' মহা মুস্কিল! আচ্ছা, আস্তে আস্তে ওর হাল্‌কা চুলে জ্যোৎস্না দিয়ে সুড়সুড়ি দেবো?

(একটু একটু সুড়সুড়ি দিতে লাগলো)

কণা॥ (হাই তুলে) এ কি! আমার ঘুম পাচ্ছে যে! না—না! আমি কিছুতেই ঘুমুবো না। উঠে দাঁড়িয়ে একটুখানি পাইচারী করি।

(উঠে ছাদে ঘুরতে লাগ্‌লো)
(মায়ের প্রবেশ)

মা॥ এ কি রে কণা, এখনো ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? চল, খাবি চল।

কণা॥ না মা, আমি ছাদ থেকে কিছুতেই ভেতরে ঢুক্‌বো না। যদি এর মধ্যে ফুল ফুটে যায়!

মা ॥ পাগ্‌লি মেয়ে ! আচ্ছা, প্লেটে করে তোর খাবার দিচ্ছি ! ছাদেই না হয় খা ! তাই বলে রাত উপোসি থাক্‌তে আছে ? কথায় বলে, রাত উপোসি থাক্‌লে হাতিও কাহিল হয়ে পড়ে !

কণা ॥ ওই ত' ঝি খাবার নিয়ে এসেছে। দে, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেয়ে নি—

(খেতে লাগলো)

মা ॥ চল্‌ লো ক্ষেমীর মা, আমার এ এক অবুঝ মেয়ে হয়েছে। ফুল ফোটা দেখবি কি করে বাপু ! লোকে শুন্‌লে যে হাস্‌বে।

(মা ও ঝিয়ের প্রস্থান)

(ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসির প্রবেশ। সঙ্গে রয়েছে দখিণ হাওয়া)

দক্ষিণ হাওয়া ॥ এই মেয়েটির নাম হচ্ছে কণা ! মাসি-পিসি, তোমরা যখন এসে পড়েছ—তখন আর কোনো ভাবনা নেই। সুন্দর একটি ছড়া গাইতে সুরু করে দাও। তক্ষুণি ওর চোখের পাতায় ঘুম নেমে আস্‌বে।

ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসির গান

আয়রে ঘুম আয়রে আয় !
কণার চোখে ঘুম যে ছায় !
সাত সাগরের হাওয়া নিয়ে পাড়াই ঘুম !
রাতের তারা দুই নয়নে লাগায় চুম !
দিনের আলোর রদ্দুরেতে আপদ-বালাই যায় !

আয়রে ঘুম আয়!
মাটির মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো শয্যাতে
ফুল যে তোমার ফুট্‌ছে নাকো লজ্জাতে!
নিশীথ রাতে ঘুমের পাখী আয় রে আয়
নিঝুম পুরে শীতল পাটি কই বিছায়?
আয়রে ঘুম আয়
কণার চোখে আয়!

মাসি॥ কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মেয়েটা এখনো ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পিসি॥ আমাদের ঘুম-পাড়ানি গান শুনে দানব ঘুমিয়ে পড়ে, আর ওই একরত্তি মেয়ের চোখের পাতায় ঘুম নেই?

মাসি॥ তাইত! ছেলে হারিয়েছে মা, চোখে একফোঁটা ঘুম নেই, ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি আমরা ছড়া গেয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়েছি।

পিসি॥ টাকার গরমে মাথা হয়েছে তপ্ত! বরফ্‌ দিয়েও একটুখানি ঠাণ্ডা হয় নি। আমরা গান গেয়ে সেই তপ্ত মাথা ঠাণ্ডা করেছি। টাকায়-গরম-মানুষের চোখেও এনে দিয়েছি কাল-ঘুম!

মাসি॥ কিন্তু এই পুঁচ্‌কে মেয়ে যে আমাদের জব্দ করল। ত্রিভুবনের লোককে আমরা ঘুম পাড়াই, আর এই কণার চোখে ঘুম আন্‌তে পারবো না! এ হল কি আমাদের?

পিসি॥ আর একটি গান ধরবো নাকি দুজনে?

মাসি॥ না-গো-না, তাহলে আরো লোক হাসবে। এই বেলা মানে-মানে পালাই চল্‌—

[মাসি-পিসির প্রস্থান]

দখিণ হাওয়া॥ মাসি-পিসি ত' পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো, এখন আমি কি করি ?

চাঁদের আলো॥ আমিও ত' অনেকক্ষণ ধরে ওর কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম! কিন্তু ভারী দুষ্টু মেয়ে! কিছুতেই ঘুমুবে না। হার মেনেছি ওর কাছে।

দখিণ হাওয়া॥ যা বলেছিস ভাই। আমার মিষ্টি হাওয়ায় কে না ঘুমিয়ে পড়ে বল! কিন্তু ও একেবারে ধানি লঙ্কা। আমাকে শুদ্ধু কাঁদিয়ে ছেড়েছে!

চাঁদের আলো॥ ও ভাই রাতের তারা! অনেক দূরে ত' রয়েছ! আমাদের একটু সাহায্য করতে পারো ?

[রাতের তারার প্রবেশ]

রাতের তারা॥ কি করতে হবে বলো! আমি আবার ছোট-খাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই নে! অনেক উঁচুতে থাকি কিনা! নোংরা পৃথিবীর কথা ভাব্‌বার সময় কৈ ? তা কি বল্‌বে চট্‌পট্‌ বলে ফেল!

দখিণ হাওয়া॥ ওই যে ছোট্ট মেয়েটিকে দেখ্‌ছ—টবের ধারে চুপচাপ বসে আছে ? ওর চোখে ঘুম আনাতে পারো ? আমরা দু'জনে ত' হিম্‌সিম্‌ খেয়ে গেলাম!

রাতের তারা॥ ওই ক্ষুদে মেয়েটাকে ঘুম পাড়াবার জন্যে আবার আমাকে ডাকতে হল ? লজ্জার কথা! এতে আমার অপমান হয় তোমরা জানো ?

চাঁদের আলো॥ তা আমাদের জন্যে একটু অপমান না হয়

তোমার হলই! দোহাই তোমার রাতের তারা, আমরা প্রাণে বেঁচে যাবো। খুকু না ঘুমুলে ফুল ফুট্‌তে পারছে না! আমাদেরও ছুটি নেই তা হলে!

রাতের তারা॥ ও! এই কথা! আচ্ছা, একটি গান গেয়ে এক্ষুনি তোমাদের পুঁচ্‌কে মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। তখন আবার আমাকে যেন পিছু ডেকো না।

রাতের তারার গান

নীল গগনে আলো জ্বালাই আমি রাতের তারা,
বিশ্ব মাঝে দিই ছড়িয়ে নতুন গানের ধারা॥
অনেক দূরে জ্বালাই প্রদীপ
তোরা ভাবিস্ কপালে টিপ্‌
সে গান শুনে তিনটি ভুবন হল পাগল পারা
সবাই ঘুমায় গানের সুরে—নিদ্রা-বিহীন যারা॥

রাতের তারা॥ এ কী। আমার গান শুনেও পুঁচ্‌কে মেয়েটা চুপ চাপ বসে রইল, ঘুমে ঢুলে পড়ল না ছাদের ওপর?

চাঁদের আলো॥ হা-হা-হা!

দখিণ হাওয়া॥ হো-হো-হো!

রাতের তারা॥ কি? আমায় অপমান! চল্লাম আমি আকাশে,

এ নোংরা পৃথিবীতে এক মুহূর্ত্তও থাকতে চাইনে। তোদেব কথা শোনাই আমার ভুল হয়েছে।

[রাতের তারা রেগে চলে গেল]

দখিণ হাওয়া ॥ রাতের তারা ত' পালালো, এখন উপায় ?

চাঁদের আলো ॥ ওই যে ভোরের শিশির যাচ্ছে। ওগো ভোরের শিশির, এই কণা মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারো ?

ভোরের শিশির ॥ আমি কি পারবো ! আমি যে অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ, কারো নজরেই পড়ি না !

দখিণ হাওয়া ॥ না, না, তুমিই পারবে। আর দেরী না, ওদিকে ভোর হয়ে এলো। তোমার মনের কথা গানে-গানে শোনাও ত !

ভোরের শিশিরের গান

ভোরের শিশির আমি টুল্ টুল্ টুল্ !
সমীরণে দোল খাই পরীদের দুল !
অতি ছোট, থাকি আমি সব আড়ালে—
পদতলে মিশে যাই হাত বাড়ালে।
নয়নের বারিপাতে ফোটাই যে ফুল ॥

চাঁদের আলো॥ কি আশ্চর্য্য! ভোরের শিশিরের গান শুনে দুষ্টু খুকু ঘুমিয়ে পড়েছে—

দখিন হাওয়া॥ আরো মজা—সঙ্গে সঙ্গে ফুলও ফুটেছে—সবার চোখের আড়ালে সঙ্গোপনে।

চাঁদের আলো॥ তাই ত বলি, ফুল ফোটার ছন্দ লুকিয়ে রয়েছে ভোরের শিশিরের কণ্ঠে। আমরা মিছেই আকাশ-পাতাল খুঁজে মরছি।

—যবনিকা—

বংশের ছেলে

[বোধনের বাবা ব্যস্ত হ'য়ে ঘরের মধ্যে পাইচারী করছেন। মাঝে মাঝে গিয়ে জানলার দিকে তাকাচ্ছেন। মুখে একটা বিরক্তির ভাব। হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন]

বাবা ॥ ওরে ফটকে—

[ফট্‌কের প্রবেশ]

ফট্‌কে ॥ আজ্ঞে বাবু—

বাবা ॥ তোদের দাদাবাবু এখনও ফেরে নি ?

ফট্‌কে ॥ আজ্ঞে, না তো বাবু—

বাবা ॥ কি মুশকিল বল্‌ দেখি ! একটা ফাউণ্টেন পেনের কালি আনতে দিলাম, তা আজও গেলো, কালও গেলো ! এদিকে আমায় গাদা-গাদা কবিতা-গল্প লিখ্‌তে হবে। সাম্‌নে পূজো।

ফট্‌কে ॥ আমি একবার এগিয়ে দেখ্‌বো বাবু ?

বাবা ॥ এখন ভাবছি, তোকে পাঠালেই হ'তো ! ছোঁড়া আমার সব ভাব মাটি ক'রে দিলো ! একটা কালি আন্‌তে হজম হয়ে গেলো নাকি ?

[বোধনের মায়ের প্রবেশ]

মা ॥ এ কি ! বোধন এখনো ফেরে নি ?

বাবা॥ অ্যাঁ! তুমিও কিছু সওদা ক'রতে দিয়েছো নাকি?

মা॥ আর বলো কেন, হঠাৎ গঙ্গাজল তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসে হাজির। বল্লাম, ফট্‌কের এখন হাতজোড়া, ছুটে যা, তু'টাকার খাবার নিয়ে আয়। তা শ্রীমানের আর দেখা নেই!

বাবা॥ মজা মন্দ নয়! আমার কালি, আর তোমার খাবার, শ্রীমান বোধনচন্দ্র আমাদের তুজনকেই ফাঁকি দিয়ে খেলার মাঠে ছোটে নি তো!

মা॥ না, না, বোধন আমার তেমন ছেলে নয়। আমি ভাবছি পথে কোনো তুর্ঘটনা ঘটলো না তো!

বাবা॥ সে কি কথা! খাবারের দোকানে যেতে তো রাস্তা পেরুতে হয় না! কোথায় গেল শ্রীমান আমি শুধু তাই ভাবছি।

[বোধনের বোনের প্রবেশ]

বোন॥ বাবা, দাদা এখনো ফেরে নি?

বাবা॥ তোর আবার কি দরকার রে?

বোন॥ আমার খাবারের পয়সা জমিয়ে দেড় টাকা ক'রেছিলাম। পুতুলের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে যে! তাইতো দাদাকে বল্লাম, পুঁতির মালা কিনে নিয়ে এসো—! সেই যে গেলো আর দেখা নেই! আজ শুভ লগ্ন। পুতুলের বিয়ে কি তা হ'লে হবে না?

বাবা॥ ব্যাপার মন্দ নয়! সবাইকার দেখছি—একই অবস্থা! একমাত্র ছেলেকে ডাইনীর হাতে সমপর্ণ!

মা॥ কি আজে-বাজে কথা বল্‌ছো! বোধন আমার তেমন

ছেলে নয়। কিন্তু গঙ্গাজলকে আর কতোক্ষণ বসিয়ে রাখি? অ্যাঁ! প্রথম দিন ছেলেপুলে নিয়ে আমার এখানে এলো, একটু মিষ্টিমুখ না করালে ভালো দেখায়?

বাবা॥ সে তো বুঝলাম! তোমার গঙ্গাজল যদি ফিরে যায়, ওগুলো ফেলা যাবে না। আমরাই হাতে-হাতে কাজ হাঁসিল ক'রতে পারবো। কিন্তু আমি ভাব্‌ছি আমার ফাউণ্টেন পেনের কালির কথা। এমন সুন্দর আইডিয়াটা মাথায় এসেছিলো—দিলে ছোঁড়া সব ভণ্ডুল ক'রে।

[বোধনের পিসিমার প্রবেশ]।

পিসিমা॥ তোমরা সবাই মিলে কি জটলা ক'রছো? বুধু কি এখনও ফেরে নি?

বাবা॥ এই দেখো! তুই আবার কি আন্‌তে দিয়েছিস?

পিসিমা॥ বারে! ওর হাতে পাঁচটাকা দিয়ে বল্লাম, আমার জন্যে ভালো উল আন্‌বি। আমার ঠাকুরপোর ফরমাস্—ওকে সোয়েটার বুনে দিতে হবে।

বাবা॥ তবেই হয়েছে! এতোগুলি টাকা ওর হাতে পড়েছে, বন্ধু-বান্ধদের নিয়ে নিশ্চয়ই রেষ্টুরেণ্টে ঢুকেছে।

মা॥ না—না, বোধন আমার তেমন ছেলে নয়। রাস্তায় কোনো গোলমাল হলো না তো? ওরে ফট্‌কে, তুই-ই না হয় একটু এগিয়ে দেখ্—

ফট্‌কে॥ আমি যাচ্ছি মাঠান্—

[দ্রুত প্রস্থান]

পিসিমা॥ তাইতো! দাদা, তুমি বল্ছো বুধু বন্ধুদের দিয়ে একেবারে রেষ্টুরেন্টে ঢুকেছে? আচ্ছা বৌদি, আমি ঠাকুরপোর কাছে কি ক'রে মুখ দেখাবো? পাঁচটা টাকা সে কতো সখ ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছে!

মা॥ মিছে তুমি ব্যস্ত হচ্ছো ঠাকুরঝি, এদিকে আমি গঙ্গাজলের সাম্‌নে কি করে যাবো—সেই হয়েছে আমার মস্ত জ্বালা।

পিসিমা॥ কেন? তোমার গঙ্গাজলের কাছ থেকেও কিছু চেয়ে নিয়ে গেছে নাকি? বুধু আমাদের মান-মর্যাদা কিছু রাখ্‌লেনা দেখছি!

বোন॥ বা—রে! তোমরা শুধু নিজেদের কথাই বল্‌ছো! এদিকে আমার পুতুলের বিয়ের যে লগ্ন বয়ে যায়···সে কথা তোমরা একবারও ভাব্‌ছো না। ওদিকে পুরুত ঠাকুর সেই কখন থেকে এসে বসে আছেন!

বাবা॥ তাইতো! সত্যিই তো ভাব্‌নার কথা হলো—

মা॥ ফট্‌কেটা গিয়েও তো আর ফিরছে না! যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ!

বোন॥ ওই যে, ওই যে দাদা ফিরে আস্‌ছে!

বাবা॥ অ্যাঁ! এতক্ষণে বাড়ীর কথা মনে পড়লো! ওরে হতভাগা, আমার কলমের কালি কৈ?

মা॥ ওরে বোধন, তোর সইমার জন্যে যে খাবার আন্‌তে দিলাম,—খাবারের ঠোঙা কৈ? ছেলেপুলে নিয়ে আর কতক্ষণ বসে থাক্‌বে বলতো!

[পিসি]মা॥ তুমি শুধু তোমার নিজের কথাই বলছো, বৌদি?

আর আমার ঠাকুরপোর উল? তার কথা তো একবারও জিজ্ঞেস ক'রছো না!

বোন॥ হ্যাঁ, কালি, খাবার, আর উল! কিন্তু আমার পুঁতির মালা না হ'লে যে, আমার পুতুলের বিয়েই বন্ধ! আমার নিজের হাত নিজে কামড়াতে ইচ্ছে ক'রছে!

বাবা॥ কি রে বোধন! কথা বলছিস্ না যে বড়ো! এতগুলো টাকা নিঁয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলি—আর তোর দেখা নেই!

মা॥ আর যদিই বা এতো দেরি ক'রে ফিরে এলি—একেবারে খালি হাতে এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছিস্?

বাবা॥ তোর যে এতোদূর অধঃপতন হয়েছে—আমি ভাবতেও পারিনি!

মা॥ এখন আমি গঙ্গাজলকে কি বলি বলতো? বড়োমুখ ক'রে তার ছেলেমেয়েদের মিষ্টিমুখ করে যেতে বল্লাম, আর তুই কি না আমার মুখ পোড়ালি?

পিসিমা॥ আর আমি? ঠাকুরপোকে কি লিখবো বলতো? মাইনে পেয়েই আগে পাঁচটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে উল কেনবার জন্যে—তুই কি না বন্ধুদের নিয়ে রেষ্টুরেণ্টে চপ্ কাট্লেট্ খেয়ে এলি?

বাবা॥ আজ সমস্ত দিন ওকে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখো। কিচ্ছু খেতে দিও না!

মেয়ে॥ কিন্তু আমার পুতুলের বিয়ে যে বন্ধ হয়ে গেলো—তার কি হবে? এমন শুভ-লগ্ন!

বাবা॥ আমাদের বংশের মুখ ডোবালি হতভাগা ছি—ছি—ছি—

(জ্যাঠামশায়ের প্রবেশ)

জ্যাঠামশায় ॥ না-না, বোধন আমাদের বংশের মুখ ডোবায় নি !

বাবা ॥ তুমি কি বল্‌ছো দাদা ?

জ্যাঠামশায় ॥ ছ'মাস আমার চাকরি নেই,—ছেলেটার শক্ত ব্যামো। তোমার কেউ উঁকি মেরেও দেখোনি। কিন্তু তোমারই দুধের ছেলে বোধন তার অষুধ কিনে দিয়েছে। ও আমার জন্যেই আজ চোর হয়েছে। কিন্তু আমি বল্‌ছি, বংশের মুখ ও ডোবায় নি, বরং উজ্জ্বল করেছে।

(বোধনকে কাছে টেনে নিয়ে)

আমি বলছি—বোধন, পরের দুঃখে কাঁদে যে মনটি—এই শুক্‌নো সংসারে তাকে হারিয়ে ফেলিস্‌নে। আমি আশীর্বাদ ক'রছি,—তুই মানুষের মতো মানুষ হবি। আমাদের বংশের নাম উজ্জ্বল করবি !

(সবাই মুখ নীচু ক'রে রইলো। বোধন তার জ্যাঠামশায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেল্লো।)

স্বপনবুড়োর সফর

খোকা ॥ সম্রাট অশোক—অ্যাঁ—অ্যাঁ "সম্রাট অশোক ভারতে সুশাসনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন।" কিন্তু ঘুম পাচ্ছে যে! কাল ইতিহাসের পরীক্ষা! নকল না করলে ত' পাশ করতে পারবো না! এক কাজ করি—শক্ত শক্ত প্রশ্নগুলির জবাব লিখে জুতোর সুকতলার নীচে লুকিয়ে রাখি – কেউ জান্‌তে পারবে না!

স্বপনবুড়ো ॥ হা—হা—হা—! ডুবে ডুবে জল খাও – একাদশীর বাবাও টের পায় না!

খোকা ॥ অ্যাঁ? কে তুমি? লম্বা দাড়ি—! ফোঁক্‌লা মুখে হাসি! তুমি কি আমায় ভয় দেখাতে চাও স্বপনবুড়ো! ঘুমের

স্বপনবুড়ো ॥ হা—হা—হা—! ভেতর রোজ তোমার স... ...য় হয়! আজ তোমায় নিয়ে যাবো অ... ...র পুরীতে!

খো... ॥ না—না—না, আমি যাবো না। কাল আমার ইতিহাসে... ...রীক্ষা।

স্ব... ॥ আরে, এসো না আমার সঙ্গে—

খোকা ॥ তাইত! তাইত! আমায় নিয়ে উড়ে চল্লে তুমি! পড়ে রইল আমার খাতা-পত্তর, দোয়াত-কলম—

স্বপনবুড়ো ॥ হা—হা—হা! [স্বপনবুড়োর হাসি]

স্বপনবুড়োর ঝুলি

খোকা॥ ওরে বাবা! কী অন্ধকার!……এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে স্বপনবুড়ো?

স্বপনবুড়ো॥ হুঁ! হুঁ! এ রাজ্যের নাম হচ্ছে আঁধারপুরী!

খোকা॥ কি সর্ব্বনাশ! একটা হনুমান একটা লোকের মাথায় পেরেক ঠুকছে! ব্যাপার কি স্বপনবুড়ো!

হনুমানের ছড়া

হুপ্—হুপ্—হুপ্—হুপ্!
মাথায় কেবল পেরেক ঠুকে করবো তোরে চুপ্!
এখন কেন চোখের পানি পড়ছে টুপ্-টুপ্!
আঁধার রাতে চালের সাথে কাঁকড় মেশাস্ খুব!
হুপ্—হুপ্—হুপ্—হুপ্!

স্বপনবু[illegible] [illegible]ঝতে পারছ ত' খোকা, এই লোকটা চালের সঙ্গে কাঁকড় মিশিয়ে ঠক[illegible] এখন তার ফল ভোগ করছে!

খোকা॥ ও স্বপনবুড়ো, আমার ব[illegible]ও এই দশা হবে নাকি? সেও যে চালের ব্যবসা করে!

স্বপনবুড়ো॥ হা—হা—হা! এসো আমার সঙ্গে—আ[illegible] কত মজা দেখতে পাবে!

খোকা॥ ওরে বাবা! এ আবার কোথায় নিয়ে এলে স্বপন বুড়ো? একটা লোককে কোমর অবধি মাটিতে পুঁতে রেখেছে! আর ডালকুত্তাটা ওকে খুবলে খাচ্ছে! কি সাঙ্ঘাতিক!

স্বপনবুড়ো॥ ওই লোকটা ওষুধের ব্যবসা করত—আর আসল

ওষুধ লুকিয়ে রেখে শিশিতে জল ভর্তী করে বিক্রী করত! সেই জন্যেই ওর এই দশা!

ডালকুত্তার ছড়া

ভোক্—ভোক্—ভোক্!
শুধু পয়সাতে তোর ঝোঁক্!
জল দিয়ে তুই জীবন নিলি—
তুই ত' ছিনে জোক্!
(এখন) তোর যত সব নাড়ি ভুঁড়ি
আমার খাবার হোক।
ভোক্—ভোক্—ভোক্!

খোকা॥ ও স্বপনবুড়ো, আমার কান্না পাচ্ছে যে!

স্বপনবুড়ো॥ কেন রে খোকা, তোর আবার কি হল?

খোকা॥ জামাইবাবুর ও যে ঐ কাজ! জামাইবাবু কি করে বাঁচবে?

স্বপনবুড়ো॥ হা—হা—হা! নকলের কারবারে নাকাল হতেই হবে! আরো মজা—দেখবে এসো—

খোকা॥ না—না স্বপনবুড়ো, আমার মাথা ঘুরছে!

স্বপনবুড়ো॥ এখুনি মাথা ঘুরলে চল্‌বে কেন? এসো—

খোকা॥ অ্যাঁ! একটা শকুন হাস্‌ছে!

শকুনের ছড়া

চোখ নেবো ঠুক্‌রে
গেলি কেন কুঁক্‌ড়ে?

আজ পেলি দুখ্ রে—
ওরে শয়তান !
বিষ দাঁত ভাঙ্ বো—
কোথা তোর কান্‌কো ?
জিব টেনে আন্‌বো—
তবে গাবো গান॥

স্বপনবুড়ো॥ হা—হা—হা ! এই বার আগে কান পেতে শোনো, কে হাস্‌ছে—

খোকা॥ এ ত' সত্যি হাসির ব্যাপার ! একটা গাধা কেবলি এক ভদ্রলোকের মাথায় চাঁটি মারছে ! হি—হি—হি

গাধার ছড়া

গাধার হাতের খাও না চাঁটি
শিক্ষা হবে পরিপাটি !
এত ত রে ভাই দাওয়াই খাঁটি !

খোকা॥ গাধাটা অমন করে হাস্‌ছে কেন স্বপনবুড়ো ? ব্যাপারটা আমায় খুলেই বলো না ! আমিও একটু প্রাণ খুলে হেসে নি !

স্বপনবুড়ো॥ শুন্‌বে ? এই ভদ্রলোক ছিলেন এক দেশনেতা। লোককে খালি লম্বা লম্বা উপদেশ দিতেন আর ভোট ভিক্ষা করে বেড়াতেন। ওদিকে লোকের টাকা মেরে তলে-তলে ছ' তলা বাড়ী তৈরী করেছেন !

খোকা॥ আর ত' আমার হাসি আস্‌ছে না স্বপনবুড়ো।

স্বপনবুড়ো॥ কেন? তুমি হাসো না প্রাণ খুলে।

খোকা॥ কিন্তু আমার জ্যাঠামশাই? জ্যাঠামশাই যে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়। বাইরে যে কথা বলে—বাড়ীতে সে কাজ করে না। বলে, বক্তিমায় অমন বল্‌তে হয় রে। কি হবে স্বপনবুড়ো?

স্বপনবুড়ো॥ হা—হা—হা।

খোকা॥ তুমি হাসছ স্বপনবুড়ো? জ্যাঠামশাই তা হলে গেল!

স্বপনবুড়ো॥ আচ্ছা, ওই ওদিকটা, যেখানে খুব অন্ধকার সেইখানে চলো—

খোকা॥ কী ভীষণ। একটা শেয়াল তার ধারালো দাঁত দিয়ে একটা লোকের গায়ের চামড়া টেনে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। উঃ।

স্বপন বুড়ো॥ শোনো খোকা, এই দেশেরই এক গরীব মা—পরণে কাপড় নেই···ছেঁড়া গামছায় নিজের গা ঢেকে হাজির হল এই লোকটার কাপড়ের দোকানে।

খোকা॥ তারপর?

স্বপনবুড়ো॥ গুদোম ভর্তি কাপড় লুকোনো ছিল। তবু সে একখানিও দিলে না। তাই ত' এই সাজা।

খোকা॥ বলো কি। আমায় ত তা হলে এক্ষুনি ছুট্‌তে হল স্বপনবুড়ো।

স্বপনবুড়ো॥ আরে পাগল ছেলে। তুমি ছুট্‌বে কেন?

খোকা॥ কিন্তু আমার মামা? তার গুদোম ভর্তি যে ধুতি-সাড়ী লুকনো রয়েছে।

শেয়ালের ছড়া

হুক্কা হুয়া—হুক্কা হুয়া—হুক্কা হুয়া।
হুক্কা হুয়া—হুক্কা হুয়া—হুক্কা হুয়া।
মোর ধারালো দাঁতের টানে বুঝ্‌বে তখন সকল ভুয়া।
চামড়া টানি শক্ত নখে
লাগ্‌বে কাঁপন সকল রগে
মায়ের-বোনের মান নিয়ে তুই এমন করে খেলিস জুয়া !

খোকা॥ স্বপনবুড়ো, আমি পালাই—

যমদূত॥ কোথায় পালাবে খোকা ? আমি যমদূত। তুমি না নকল করে পরীক্ষায় পাশ করতে চেয়েছিলে ? আজ করাত দিয়ে তোমার মাথা আমি দুখানা করে ফেল্‌বো—

খোকা॥ উঁ—হুঁ-হুঁ। গেলুম-গেলুম—কোথায় আছ—ও স্বপনবুড়ো—আমায় বাঁচাও।

মাষ্টারমশাই॥ এই খোকা—পড়তে পড়তে ঘুমোনো হচ্ছে। ওঠ শীগ্‌গির।

খোকা॥ ও! মাষ্টারমশাই আপনি! আমার মাথায় চাঁটি মেরে তুল্লেন! আমি ভাবছিলুম যমদূত আমার মাথায় করাত চালাচ্ছে। উঃ। কী ভয়ানক। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—আর কখনো নকল করে পাশ করতে চাইবো না। এইবার নকল ভুলে আসল মানুষ হয়ে উঠ্‌বো।

স্বপনবুড়ো॥ হা-হা-হা। কেমন জব্দ !


চিঠি

স্ব

শীগ্‌গির

খে

মেরে

যুগান্তর
ছোটদের পাত্তাড়ি
রবিবার, ১০ই অগ্রহায়ণ,
১৩৫৭।

আমার কিশোর-কিশোরী বন্ধুর দল,

সব পেয়েছির আসরের বার্ষিক উৎসব প্রতি বছর একই সময়ে হয়ে আসছে। সুনির্দিষ্ট তার পরিকল্পনা, সহজ পথে তার গতি। আগামী বার্ষিক উৎসবের বিভিন্ন বিভাগের কাজে কর্মীরা আপ্রাণ পরিশ্রম করছে—তারা জানে, সব পেয়েছির আসর ভারতের কিশোর সংগঠনের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও কর্মবহুল কেন্দ্র। দেশ স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে লাট সাহেবের প্রাসাদ থেকে ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল রাজাজীর আমন্ত্রণ পেলো শ্রেষ্ঠ কিশোর কল্যাণ প্রতিষ্ঠান সব পেয়েছির আসর। রাজাজী আসরের কর্ম পরিকল্পনা দেখে সুখী হয়ে স্থায়ী সভাপতি হতে রাজী হলেন। শুধু ভারত জুড়েই যে আসরের কাজ তা' নয়—ভারতের বাইরেও আসর কেন্দ্র-স্থাপন করে দেখিয়ে দিল যে, এশিয়ার জ্ঞানালোক দেশবিদেশে বহন করে নিয়ে যাবে এই কিশোর-কিশোরীর দল। দেহের ও মনের গঠন এক সঙ্গে চললো আসরে। এই নীরব তপস্যার ফলে সব পেয়েছির আসর যেখানে গিয়েছে জয়মাল্য লাভ করে ফিরে এসেছে। শ্রীঅরবিন্দের জন্ম-তিথি উৎসবে—দেশের সমস্ত কিশোর প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পদক লাভ করেছে সব পেয়েছির আসর। দেশের নামকরা শিল্পীরা আসরের প্রদর্শনী দেখে একবাক্যে বলেছেন, এমন বিজ্ঞান-সম্মত পরিকল্পনা

বড়রাও করতে পারে না। "ঘাটশীলা শিক্ষা শিবিরের" চিত্র দেখে দেশের ছেলেমেয়েরা অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং আজ অনেকেই তার অনুসরণ করবার চেষ্টা করছে মাত্র। জন্মভূমির যা কিছু পুরাতন সংস্কৃতি তাকে উদ্ধার করেছে সব পেয়েছির আসর।—এই ভাবে আলপনা শিল্পকে সে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছে, ছোটদের মধ্যে জাগিয়েছে সন্তরণের উৎসাহ, ঘরে ঘরে স্থাপন করেছে পাঠাগার, শিক্ষামূলক গানে আসর-প্রাঙ্গণ আজ মুখরিত হয়ে উঠেছে। ভারতের সাধারণ মঞ্চে সর্বপ্রথম শিশু-নাট্যের প্রবর্তন করেছে এই আসর, তাইত' আজ আসরকে আহ্বান জানিয়েছে "নিখিল ভারত মহিলা সমিতি" এবং সাগ্রহে আসরের ছেলেমেয়েদের হাতের কাজ বিমানযোগে নিয়ে বোম্বাই অঞ্চলে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। সাগর পার থেকে এসেছে সাহায্য—; আসরে সোনার কাঠির দল নিজের হাতে অনাথ বালক-বালিকাদের পাঠ্য পুস্তক কিনে দিয়েছে। এ দেশে সর্বপ্রথম পদব্রজে অভিযান সুরু করেছে সব পেয়েছির আসরের সোনার কাঠির দল। তারা দেশকে জান্‌ছে আর মানুষকে আপনার করে নিচ্ছে। বিজ্ঞানের অনুশীলনে তারা গিয়েছে অনেকখানি এগিয়ে। পৌষ-পার্বণ উৎসবের ভেতর

তারা হারিয়ে যাওয়া সোনার যুগকে আবার ফিরে পাবার তপস্যা করছে। যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু পবিত্র তাই নিয়েই আসরের পরিকল্পনা। দেশের অভিভাবকেরা আজ জানেন, বিদ্যালয়ে দশ বছরে যা শিক্ষা হয় না, 'আসর' ছয় মাসে তা হাতে-কলমে শিখিয়ে দেয়। তাই ত' "সব পেয়েছির আসর" আজ এত বেশী মানুষের মনকে অধিকার করে বসেছে। রক্ত-চক্ষুর শিক্ষা ছোটদের ভয় পাইয়ে দিতে পারে কিন্তু শিশু মনে ফুল ফোটাতে পারে না। আসর সেই ফুল ফোটানো আর গান জাগানোর মধুর-ব্রত গ্রহণ করেছে। তবু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, দেশে পরশ্রী কাতরের অভাব নেই। একটা ভালো কাজ সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হতে দেখ্‌লে অনেকেই তাকে পণ্ড করবার জন্যে এগিয়ে আসে! তাই নিজের নাক কেটে পরের

যাত্রা ভঙ্গ করার প্রথা এই ভারতবর্ষেই প্রচলিত আছে। কিন্তু পথ চল্‌বার দাবী আমরা লাভ করেছি। সঙ্কল্প আমাদের অটুট। আমরা চলেছি জ্ঞানের পথে, কর্মের পথে—নব-পৃথিবী গড়বার নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। পুরাতনের অচলায়তনকে ভেঙ্গে দেবার ক্ষমতা আমাদের আছে। আমরা বিশ্ব-বীণার সুর শুনতে পেয়েছি। তাই-ত' সরল মনে, সহজ সুরে, আদর্শের প্রেরণা নিয়ে বিশ্বকবির সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে পারছি—

"বিশ্ব জগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর—
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে—
কোথায় আমার ঘর?"

আজ এইখানেই চিঠি শেষ করছি। তোমরা সকলে আমার প্রীতিও শুভেচ্ছা নাও। ইতি—

তোমাদের বন্ধু
স্বপনবুড়ো

ছোটদের পাত্‌তাড়ি
রবিবার, ২৫শে চৈত্র, ১৩৫৭।

আমার কিশোর-কিশোরী বন্ধুর দল,

গত সপ্তাহে কথা প্রসঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষক এবং অভিভাবকবৃন্দ দুটি অভিযোগের কথা উত্থাপন করেছিলেন। অভিযোগটা তোমাদেরই বিরুদ্ধে। আমি তার জবাব দিতে পারিনি। তোমরা কি তার জবাব দিতে পারো? অভিযোগ দুটি আমি এখানে উল্লেখ করছি।

প্রথম অভিযোগ : সম্প্রতি দেখা যায় "কেবলমাত্র বয়স্কদের জন্যে ছবি"র প্রাদুর্ভাবটা একটু বেশী দেখা যাচ্ছে। যে মুহূর্তে ছবিটি বয়স্কদের জন্যে ঘোষিত হল—অমনি দেখা গেল সেখানে ইস্কুলের ছেলেদের ভীড় সব চাইতে বেশী। আরো মজার কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ছোটদের টিকিট না দেয়ার ব্যাপারে কোনো রকম ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয় না। যখন সেন্সর বোর্ড ছবিটিকে "কেবলমাত্র বয়স্কদের জন্যে" বলে ঘোষণা করলেন তখনই কি সরকারের এ দিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে না? দুটি মাত্র পুলিশের লোক এই অ-ব্যবস্থা দূর করতে পারে। ছোটদের টিকিট না দিলেই হয়। কিন্তু সেই না দেয়াটার ব্যবস্থা করবে কে? সরকার প্রেক্ষাগৃহে ধূমপান বন্ধ করেছেন কিন্তু ছেলেরা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে কিম্বা—অভিভাবকের পকেট কেটে বয়স্কদের ছবি দেখছে—সে ব্যাপারে দেশের সবাই নির্বিকার। অথচ যে কোনো স্বাধীন দেশে খবর নাও—ছেলে-মেয়েরা একবাক্যে বল্‌বে—"আমাদের উপযুক্ত ছবি চাই। বড়দের আজে-বাজে ছবি আমরা দেখ্‌বো কেন?" এজন্যে প্রয়োজন হলে তারা শিক্ষামূলক ছবির ব্যাপারে নিজেদের ন্যায্য দাবী জানাতেও পেছ পা নয়! আর আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের অবস্থা যেন বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি! তাই সত্যি প্রশ্ন ওঠে যে, কোন্ দেশের ছেলে-মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে আমরা এমন প্রাণপাত পরিশ্রম করছি? সরকার নির্বিকার, অভিভাবক নাকে-কানে তুলো গুঁজে আছেন, শিক্ষক বল্‌ছেন, আমরা প্রহারের ভয়ে চুপ করে থাকি! সে দেশের ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে বিরাট কিছু পরিকল্পনা করা বাতুলতা নয় কি!

দ্বিতীয় অভিযোগ হচ্ছে এই যে, বাস্তুহারাদের জন্যে আমরা সবাই বেদনা বোধ করি। সবাই যথাসাধ্য সাহায্যও করি; আমরা নিজেরাই অনেকে বাস্তুহারা। কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজনে বড়রা যখন মিছিল বের করেন, আন্দোলনের জন্যে যখন সভা ডাকেন তার ভিতরে শিশুদের কেন মিছে টেনে

নিয়ে যাওয়া হয়? এই কাঠফাটা রদ্দুরে কত ছেলে-মেয়ে যে অসুখে পড়ে নেতারা কি তার সন্ধান রাখেন? তাই শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দের দাবী যে, রাজনীতি করতে হয় বড়রা করুন। ছোটদের অকারণ "স্কেপ গোট্" করা কেন? তারা রাজনীতির কি বোঝে? পরের শেখানো জিগির পথে পথে বলে তাদের কি লাভ হয়? তার চাইতে নেতারা যদি তাদের জন্যে টিফিনের ঘণ্টায় এক গেলাস করে খাঁটি দুধের ব্যবস্থা করেন ত' ছেলে-মেয়েরা প্রাণে বাঁচবে। আগামী দিনের নাগরিকরা সুস্থ সবল হয়ে উঠতে পারবে। রাজনীতির নাগর-দোলায় ছোটদের চাপিয়ে দিয়ে এই জাতীয় ঘূর্ণিপাক খাওয়ানো আদপেই উচিত নয়। 'সব পেয়েছির আসর' বাস্তুহারাদের জন্যে তাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যথেষ্ট করেছে, ভবিষ্যতেও করবে—এই পরিকল্পনা তার আছে। কিন্তু ছোটদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে রাজনীতির বলি হতে সোনার কাঠিদের সত্যি আপত্তি আছে। এ বিষয়ে তোমাদের কি মতামত জানিও।

আমাদের নববর্ষ উৎসবের উদ্যোগ-পর্ব সমাধা হয়ে গেছে। নববর্ষের আমন্ত্রণ-লিপি পাততাড়ির পাতায় অন্যত্র প্রকাশিত হল। তোমরা নিজেরা দল-বেঁধে আসবে, দাদা-দিদিদের খবর দেবে; সঙ্গে করে আনবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক মশাইদেরও আমরা সাদর-আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের নববর্ষ উৎসবে বরাবরই আমরা নাবদের নিমন্ত্রণ করে থাকি। নববর্ষের প্রত্যূষে এসে সোনারকাঠিদের সমবেত ব্যায়াম দেখে তাদের উৎসাহিত করো, দেশের ভাই-বোন সবাইকার কাছেই আমাদের সেই অনুরোধ। আজ রবিবার সকাল আটটায় শোভাবাজার রাজ বাটিতে নববর্ষ ব্যায়ামের মহড়া হবে। উত্তর কল্‌কাতার আসরগুলিকে এই মহড়ায় যোগ দিতে হবে। হাওড়া অঞ্চলে ১লা বৈশাখ বিকেলে নববর্ষ উৎসব হচ্ছে। ভারত সব পেয়েছির আসরে সব সংবাদ মিলবে। হাওড়ার সোনারকাঠিরা খবর নাও।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বর্ষ-শেষের চিঠি এইখানেই শেষ করছি। ইতি

তোমাদের বন্ধু,

স্বপনবুড়ো

ছোটদের পাততাড়ি
রবিবার, ১লা বৈশাখ,
১৩৫৮

আমার কিশোর-কিশোরী বন্ধুর দল,

আজ নববর্ষের পুণ্য প্রত্যুষে সোনারকাঠিদের জানাই আমার প্রাণের প্রীতি ও অম্লান শুভেচ্ছা। ১৩৫৮ সাল অরুণ কিরণের মুকুট পরে নবীন পথিকের বেশে আমাদের দ্বারে এসে করাঘাত করছে। আমরা কি তাকে আমাদের মাঝখানে সাদরে বরণ করে নেবো না? নববর্ষের মুখে আত্ম-প্রত্যয়ের মধুর হাসি, হাতে সূর্য-কিরণে ঝল্‌সে উঠ্‌ছে—পথের বিঘ্ন দূর করবার জন্যে খরধার তরবার, গায়ে তার সবাইকে মেলাবার রঙীন উত্তরীয়। কর্ণে দুল্‌ছে তার দৃঢ়সঙ্কল্পের কুণ্ডল। কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে এক সূত্রে বন্ধনের সুবাসিত মাল্য। মাঝে মাঝে সে মঙ্গল-শঙ্খে আহ্বান জানাচ্ছে সবাইকে। কেউ আর ঘুমিয়ে থেকো না। দুয়ার খুলে বেরিয়ে এসো—আমরা ওই নবীন সাথী নববর্ষকে আপনার করে ডেকে নিই, আর মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করি যে, নতুন বছরের প্রত্যেকটি দিন আমরা কর্মমুখর করে তুল্‌বো।

নতুন বছরে "মিষ্টি সন্দেশ" পরিবেশনের একটা প্রথা আছে। তাই আজ তোমাদের একটি মিষ্টি খবর জানিয়ে দিচ্ছি। "সব পেয়েছির আসরের"

উদ্বোধন সঙ্গীত—"জাগো কিশোরী, জাগো কিশোর" তোমরা প্রত্যেকই জানো। দেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এই গানখানি বিভিন্ন সভা-সমিতি, উৎসব অনুষ্ঠানে গেয়ে থাকে। গানখানির জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে কলম্বিয়া কোম্পানি রেকর্ড করে নিয়েছেন। এই রেকর্ডের একদিকে থাকবে "জাগো কিশোরী, জাগো কিশোর" গানটি আর অপরদিকে থাকবে—"পক্ষী রাজের পিঠে আমার উধাও হল মন" রূপকথার এই অপরূপ সঙ্গীতটি। দেশের ছেলে-মেয়েদের জন্যে আলাদা গান আর আলাদা রেকর্ডের প্রয়োজন আছে, একথা আমরা বহুবার বলেছি এবং এ সম্পর্কে আন্দোলনও চালিয়েছি। কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানি যে তোমাদের অভাব দূর করতে এগিয়ে এসেছেন, সেজন্য আসরের পক্ষ থেকে আমরা প্রতিষ্ঠানটিকে ধন্যবাদ জানাই। যথাসময়ে রেকর্ডটি প্রকাশিত হবে।

আসরের বর্ষ শেষের সাহিত্য সভা বসে বড়িষা সব পেয়েছির আসরে। এইদিনের অনুষ্ঠান খুব সুন্দর হয়েছিল। স্থানীয় সোনারকাঠিদের উৎসাহ ও অভিভাবক-অভিভাবিকাবৃন্দের প্রেরণা দান লক্ষ্য করবার বিষয়। সম্মেলনে সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীযুক্তা সুজাতা রায় এবং প্রধান অতিথি ও বিচারকের আসন গ্রহণ করেন—অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল—"নীতি গল্প"। বিচারে শীলা দে প্রথম ও নিবেদিতা আসরের সনৎ ভট্টাচার্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পুরস্কার লাভ করে। মূল সত্যসেবী ও সাহিত্য-সচিব পুরস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

আজ আমাদের নববর্ষ উৎসব সম্পন্ন হবে দেশবন্ধু পার্কে সকাল ঠিক আটটায়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন এবং নববর্ষের বাণী শোনাচ্ছেন ছোটদের হিতৈষী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনীষী ডাঃ কালিদাস নাগ। ছোটদের ডাকে তিনি সব পেয়েছির আসরে আগেও এসেছেন, আজও আনন্দের সঙ্গে আসছেন। যারা ব্যায়াম প্রদর্শন করবে এবং মাঠে স্বেচ্ছা-সেবকের দায়িত্ব নিয়েছ, তারা সকাল সাতটার মধ্যে দেশবন্ধু পার্কে গিয়ে

উপস্থিত হবে। ছেলেদের পোষাক হবে—সাদা হাফ প্যাণ্ট, সাদা গেঞ্জী কিন্তু খালি পা। ছোট মেয়েদের সাদা ফ্রক্ এবং বড় মেয়েদের লাল পাড়ওয়ালা সাদা সাড়ী। আশা করি, ময়দানে সবাই নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে আমাদের নববর্ষ উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবে। এই উৎসবে আমরা দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ইতি—

তোমাদের বন্ধু

স্বপনবুড়ো

ছোটদের পাত্‌তাড়ি

মঙ্গলবার, ৩০শে আষাঢ়, '৬০।

আমার কিশোর-কিশোরী বন্ধুর দল

জগন্নাথের রথযাত্রা এই সপ্তাহে পড়েছে। গতকাল প্রথম উৎসব শেষ হয়ে গেল। তোমরা আজকের দিনে টিনের রথ কিনে আর গরম-গরম পাপর ভাজা খেয়ে রথের উৎসব পালন করো,—আর আমরা ছেলেবেলায় গ্রাম দেশে থাকতাম—লট্‌কা ফল যখন পাকতে সুরু হত তখন বল্‌তাম রথ এসে গেল। গ্রাম অঞ্চলে রথযাত্রার ভারী ধুমধাম। জল আর কাদা ভেঙে বৃষ্টিতে ভিজে রথের মেলায় যাওয়া। পাতার বাঁশী আর কাঠের রথ কেনা। রথের উদ্দেশ্যে কলা আর চিনি উৎসর্গ করা, দল বেঁধে রথের দড়ি ধরে টানা, মেলা শেষে আবার যার যার বাড়ীতে ফিরে আসা

তাই বলে তোমরা মনে কোরোনা যে, শুধু বৃষ্টিতে ভেজা, কাদা মাড়িয়ে হাঁটা, দশজনের সঙ্গে হুল্লোড় করে পথ চলা আর গরম গরম পাপর ভাজা

খাওয়ার মধ্যেই রথযাত্রার সব কিছু আনন্দ আর সব কিছু মজা লুকিয়ে আছে।

জগন্নাথের রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দ নিয়তই ধ্বনিত হচ্ছে। যে জনতা থেকে আলাদা হয়ে, একান্ত নিষ্ঠায় কান পেতে থাকে সে শুনতে পায় জগন্নাথের রথের চাকার শব্দ। সে শব্দ কি বলছে জানো? বলছে, জগন্নাথের রথ-চক্র কখনো থেমে থাকে না—সে চিরকাল এগিয়ে চলেছে—মুমূর্ষুদের ঘুম ভাঙিয়ে, অলস আর কুঁড়েদের দ্বারে করাঘাত করে, জীবনে যারা হতাশ হয়ে পড়েছে—তাদের প্রাণে আশার বাণী শুনিয়ে ওই ত জগন্নাথের রথের চাকা চলেছে এগিয়ে।

এই রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ কান পেতে শুনতে পেয়েছিলেন নদীয়ার নিমাই। তাই ঘর তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি, মায়ের স্নেহ তাঁর পথরোধ করতে পারেনি, স্ত্রীর চোখের জল করতে পারেনি তাঁর পথকে পিচ্ছিল। তাইত তিনি উন্মাদ হয়ে পথের ধূলোয় নেমে এসেছিলেন, জনতার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন, ছুটে ছিলেন জগন্নাথের মন্দিরের উদ্দেশ্যে।

তাই ত মহাত্মা গান্ধী জন-জাগরণের কঠিন ব্রতের ভেতর দিয়ে রথের রজ্জু প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিলেন : তবেই না আসমুদ্রহিমাচলের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল, নতুন আদর্শ গ্রহণ করে সবাই এগিয়ে গিয়েছিল—স্বাধীনতার স্বর্ণ-রথে।

তোমরা যারা সংগঠনের পথে এগিয়ে এসেছ,—গড়ে তুলেছ—সহরে, সহরতলীতে, গ্রামে আর দূর-দূর অঞ্চলে—নতুন নতুন আসর—তারা যদি কান পেতে থাকো ত' শুনতে পাবে জগন্নাথের রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দ। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই, নেই তার কোনো অবসাদ।

জগন্নাথের রথচক্র ক্রমাগত মানুষকে আশ্বাস দিচ্ছে, ভরসা দিচ্ছে, আর নিষ্ক্রিয় হয়ে স্থানুর মতো বসে থাকতে নিষেধ করছে। বজ্র-নির্ঘোষে সে দিবা-নিশি ঘোষণা করছে—ওঠো, জাগো, এসো, নিজের নিজের আদর্শে আত্ম-নিয়োগ করো। কর্মহীন জীবন ত' মৃত্যুর নামান্তর। কে জীবনে হতাশ

হয়েছ ? কে পথ খুঁজে পাচ্ছ না ? কে নিজের আদর্শকে ভুলে বসে আছ ? চলে এসো, চলাই ত' জীবন। অর্ধপথে বসে পড়াই ত' মৃত্যু। তাই শুধু এগিয়ে চলো—।

কান পেতে শোনো তোমরা, জগন্নাথের রথের চাকা তাই বল্‌ছে কিনা ! প্রীতি ও শুভেচ্ছা নাও সবাই। ইতি—

তোমাদের বন্ধু

স্বপনবুড়ো

ছোটদের পাত্‌তাড়ি

মঙ্গলবার, ২৮শে পৌষ, ১৩৬০।

আমার কিশোর-কিশোরী বন্ধুর দল,

আমাদের সব-পেয়েছির আসরের ৮ম বার্ষিক সম্মেলন শেষ হয়ে গেছে। যারা অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলে তাদের ত' কথাই নেই, আর যারা ভারতের দূর দূর অঞ্চলে বাস করো তারাও গত সপ্তাহের পাত্‌তাড়ির সচিত্র সংখ্যা দেখে সব কিছু বুঝতে ও জান্‌তে পেরেছ।

প্রদর্শনী আর উৎসবে যোগদান করে যারা ঘরে ফিরে গেছে—তাদের কাছে মনে হচ্ছে, এ বছরের মতো সব কিছু ত' শেষ হয়ে গেল। তারা আবার আগামী বছরের বার্ষিক সম্মেলনের কথা ভাবতে স্থরু করেছ। আমার কাজ কিন্তু মোটেই শেষ হয়নি। তোমরা রসিদ দেখিয়ে যে যার জিনিস ফেরৎ নিয়ে গেছ, উৎসবে কেউ নেচেছ, কেউ অভিনয় করেছ আবার কেউ খেলাধূলা কিম্বা ব্যায়ামের কসরৎ দেখিয়েছ। স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দও তাদের দায়িত্ব পালন করে ঘরে ফিরে গেছে। তার পর প্রদর্শনী গিয়েছে ভেঙে, উৎসবের বাঁশী গিয়েছে থেমে, সম্মেলনের আলো গিয়েছে নিভে। এইবার

আমাদের একান্তে বসতে হবে সব কিছু হিসেব-নিকাশ নিয়ে। এই সম্মেলনের বিভিন্ন বিভাগে কি সব খরচ হল—তার হিসেব মেলাতে হবে ঠাণ্ডা মাথায় বসে। আর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দেখতে হবে—কোথায় আমাদের ভুল হল, কোথায় ত্রুটি ঘট্‌ল, অনুষ্ঠান আর অভিনয় কোন দিন মনোমত হয়নি—এই সব খতিয়ে দেখতে হবে, ভালো করে করতে হবে বিচার। আগামী বছর আমাদের বার্ষিক উৎসব সকল দিকে দিয়ে আরো চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠ্‌বে। নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি ভালো করে বিচার করলে যে অভিজ্ঞতা বাড়ে তার দাম অনেকখানি। সেই জন্যে প্রত্যেকটি বড় উৎসবের পর নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতি ভালো করে আলোচনা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এই রকমটি যাতে আর না ঘটে তার জন্যে প্রত্যেক কর্মীকে সচেতন থাকতে হবে। তোমরা প্রত্যেক আসরে আশাকরি এই নিয়মটি মেনে চল্‌বে।

গত সপ্তাহে বঙ্গীয় যক্ষা-নিবারণী সমিতির একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। যে সব ছেলেমেয়ের ব্যাধি সেরে গেছে তাদের রচনা, ছবি আঁকা, হাতের কাজ প্রভৃতির একটি প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ করা হল। একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল। এদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কি ব্যবস্থা করা যায় সে সম্পর্কেও আলোচনা হল। অবশেষ দেখানো হল যক্ষ্মারোগ দূর করা সম্পর্কে কতকগুলি দেশী-বিদেশী চলচ্চিত্র। এই সমিতির উন্নতি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।

গত শনিবার কল্যাণীতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম—যেখানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন হবে। সারাটি দিন ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখ্‌লাম। এবার বিরাট পরিকল্পনা করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনের শিল্পী ছেলে-মেয়েরা ছবি আঁক্‌ছে। একদিকে প্রকাণ্ড প্রদর্শনী গড়ে উঠ্‌ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মঞ্চ, সর্বোদয় পারকল্পনা, অধিবেশনের স্থান, প্রতিনিধিদের আবাস, কংগ্রেস-সভাপতির ভবন, রেলওয়ে, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ অফিস ময়দানবের হাতে সব দ্রুতগতিতে তৈরী হচ্ছে। অভ্যর্থনা সমিতির

কার্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের সঙ্গে দেখা হল। ওখানকার কর্মীরা দেখালেন—কোথায় শিশু উদ্যান গড়ে উঠবে। তারও একটা পরিকল্পনা করে দেয়া হল। সেখানে দেশের হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের কাছে এসে হাজির হবেন কংগ্রেস-সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল। নেতাজীর মূর্তিতে কোথায় মাল্যদান করা হবে, কোথায় মৃৎশিল্পীদল নানা রকম পুতুল গড়ে তুল্ছে, কোথায় থাক্বে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রদর্শনী—সব আমরা দেখ্লাম। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের যাদুতে যেন বিশালপুরী কল্যাণী রূপলাভ করছে। ছোটদের অনুষ্ঠানও ওখানে হবে একদিন। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে কল্যাণীর কাহিনীর অনুপ্রেরণায় সংগঠনের পথে এগিয়ে চলুক এই কামনা জানিয়ে এ সপ্তাহের চিঠি এইখানেই শেষ করি।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই সবাইকে। ইতি

তোমাদের বন্ধু
স্বপনবুড়ো

ছোটদের পাত্তাড়ি
মঙ্গলবার, ১৯শে পৌষ, '৬১

আমার কিশোর-কিশোরী বন্ধুর দল,

আমাদের সবপেয়েছির আসরের নবম বার্ষিক সম্মেলন ও প্রদর্শনী এই মাত্র শেষ হয়ে গেল। গান থেমে গিয়েছে, তবু তার সুরের রেশ এখনো দুই কানে ধ্বনিত হচ্ছে। সেই সুর শুধু যে কানেই ঝঙ্কার তুল্ছে তাই নয়, প্রাণেও শিহরণ জাগিয়েছে। যারা কল্কাতায় এবং আশে-পাশে ছিলে তারা এই সম্মেলনে যোগদান করে বেশ কিছুটা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেছ। কিন্তু

যারা দূরে দূরে আছ,—একমাত্র পাত্‌তাড়ি পড়েই সম্মেলনের সব কিছু জান্‌তে চাও এবং এই মধুর সন্দেশের জন্যে উৎসুক হয়ে থাকো—আমি প্রতি বছর তাদের জন্যেই পাত্‌তাড়ির একটি সচিত্র-সংখ্যা প্রকাশ করে থাকি।

এ বছরও দূরের সোনারকাঠিদের জন্যে একটি সচিত্র সংখ্যা প্রকাশ করছি। পাত্‌তাড়ি এবং সবপেয়েছির আসরের একজন অনুরাগিণী অভিভাবিকার একটি চিঠি এই সপ্তাহে প্রকাশ করা হল। এই চিঠিখানি পড়লেই তোমরা বুঝ্‌তে পারবে যে, আসরকে প্রাণ দিয়ে ভালো বাসেন বলেই—অপ্রিয় সত্য কথা বল্‌তে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেননি।

উৎসব ত' শেষ হয়ে গেল,—কিন্তু সম্মেলন আর উৎসবই ত' আসরের শেষ কথা নয়। উৎসবের প্রয়োজন আছে ছোটদের মনে উৎসাহ এবং প্রেরণা জোগাতে। এইবার থেকে আবার নতুন পরিকল্পনা করে সংগঠন-মূলক কাজে হাত দিতে হবে।

সারা বছর ধরে হাড়ভাঙা খাটুনীর পর উৎসব যেন আনন্দের ইন্দ্রধনু রচনা করে সবাইকার চিত্তাকাশে। তাই ত' যখন তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষা চুকে যায়, তোমরা সব নতুন ক্লাশে প্রমোশন পাও—তখনই সব-পেয়েছির আসরের উৎসবের বাঁশী বেজে ওঠে। এগিয়ে এসো তখন ছেলে-মেয়েদের দল, প্রাক্তন সভ্য-সভ্যারা, আর সেই সঙ্গে কেন্দ্রের কর্মিবৃন্দ। সবাই-কার সমবেত চেষ্টা না থাকলে কি এই বিরাট সম্মেলন সমাধা হয়?

সবাইকেই আমাদের প্রয়োজন আছে। রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধ করেছিলেন—সামান্য কাঠবিড়ালীর সহযোগিতাও তিনি উপেক্ষা করেননি। তিল-তিল সংগ্রহ করেই তাল হয়। ইংরেজ কবি মিল্টন একটি বড় সুন্দর কথা বলেছেন। সেই দামী কথাটা হচ্ছে—"He also serves who only stands and wait." যে কর্মী প্রদর্শনী সাজায়, যে রাজপথে শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, যে ছেলেমেয়েদের অভিনয় শিক্ষাদান করে, যে খাবার ঘরে ছোটদের মধ্যে খাবার পরিবেশন করে, যে অনুষ্ঠানে

শঙ্খধ্বনি করে এবং যে স্বেচ্ছাসেবকরূপে দ্বার রক্ষা করে—এই প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে। সবাইকার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টাই ত' সাফল্যকে আহ্বান করে নিয়ে আসে। কাজেই কোন কর্মী ছোট নয়, তুচ্ছ নয়—অবহেলা করার মানুষ নয়। ছোট্ট বীজের মধ্যে মহীরূহ লুকিয়ে আছে। আমাদের আসরের ক্ষুদে সোনারকাঠিদের মধ্যেই আগামীকালের মহাভারতের পূর্ণ কর্মী লুকিয়ে আছে—সে কথা কোনো মতেই ভুল্‌লে চল্‌বে না।

এবারকার প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে এসে সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছেন যে, ছোটদের এই শিল্প-সম্ভারকে স্থায়ী ভাবে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হলে—রাষ্ট্রের সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। আমিও আজ এই কথা বলে আমাদের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দৃষ্টি এই শিশুকল্যাণের দিকে আকর্ষণ করছি। তিনি দেশকে বড় করবার স্বপ্ন দেখেন, আশাকরি তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনে শিশুদের কথাও নতুন করে চিন্তা করবেন।

সম্মেলন অন্তে তোমাদের সবাইকে জানাই আমার প্রীতি, স্নেহ ও আন্তরিক ভালবাসা। ইতি—

তোমাদের বন্ধু

স্বপনবুড়ো


স্বপনবুড়োর

মানুষের সনে যত মিশি দেখি—
সবাই মায়ায় ভরা
কেউ বা একটু লাবণী মাখানো
কেউ বা একটু কড়া !

*

খুকুমণি শুয়ে তুমি
নক্‌সী কাঁথায়
রাত দিন চোখ শুধু
তোমাদেরই চায় ॥

*

শ্যাম্‌লা দেশের তুমি শ্যামলী মেয়ে
সূর্যমুখীর মতো আছ যে চেয়ে !
নব-গৃহে ফুটাইবে মধুর হাসি—
সবে ডেকে কবে তোমা ভালো যে বাসি !

*

নতুন করিয়া কি আশীর্ব্বাণী দেবো তোমাদের লাগি ?
ছেলে-মেয়েদের কুশল লাগিয়া সদা আমি রাত জাগি।
যে যেখানে আছ কামনা জানাই, ভালো আর সুখে থাকো,
কারো মনে যদি ব্যথা দিয়ে থাকি—স্মরণে রাখিও নাকো ॥

*

স্বপনবুড়োর ঝুলি

সন্ধ্যা-মালতি তুমি
শান্ত মেয়ে
সাঁঝের প্রদীপ সম
আছ যে চেয়ে॥

*

নয়া বই তুলে দিনু
নব-বধূ হাতে
'বই' আর 'বউ' থাক্
শ্রীমানের সাথে॥

*

তোমার বিয়ের দিন এসেছে ফিরে
প্রেম-প্রীতি দিয়ে গৃহ রাখিও ঘিরে।
নতুন করিয়া নাও সাথীরে চিনে
পথ চলা দায় জেনো সঙ্গী বিনে।

*

রুপা বলে মিষ্টি মেয়ে বিদ্যালয়ে পড়ে—
পরীক্ষাটা আস্‌লে ঘাড়ে ভেবে ভেবেই মরে।
অঙ্ক খাতায় মিল্‌লে পরে গোল্লা বড়ো-বড়ো—
বল্লে, "খাবো-রসগোল্লা, তোমরা সবে সরো॥"

*

তোমার জীবনে পূর্ণিমা এলো বুঝি?
জীবনের সাথী আজি পেলে তাই খুঁজি?
যে গৃহে আসিলে তাহার তুলসী তলে—
সন্ধ্যা-প্রদীপ যেন গো নিয়ত জ্বলে॥

*

স্বপনবুড়োর ঝুলি

ছোট ফুল, ছোট গান
তাই নিয়ে বাঁচে প্রাণ ॥

*

"বিয়ে আমি করবো নাকো"
হিমাংশুরই পণ
এই বাঙালীর দেহে পরাণ
থাকবে যতক্ষণ
ওমা দেখি ঘোমটা দিয়ে
কনক আসে ঘরে
আমাদেরই বঙ্গবীরের
পণ ভাঙিবার তরে ॥

*

নব আশা লয়ে এ নব পথের
তোমরা দুজনে যাত্রী
এ পথে মিলিবে উজ্জ্বল দিন
ঘন কালো অমা-রাত্রি।
ভয় পেয়ো নাকো, সোজা চলে যাও
হাত রাখি দোঁহা হাতে—
ঊর্দ্ধ আকাশে নিজে ভগবান
আশিস্ ছড়াবে মাথে ॥

*

লেখাগুলো যেন
মনের আঁচড় টানা
যতদূর চোখ যায়
তত যায় জানা ॥

স্বপনবুড়োর ঝুলি

*

অজন্তা, শিপ্রা ও ইলোরা মেয়ে
নৃত্যে ও গানে ধরা ফেলিলে ছেয়ে।
সুনীল, অজিত তাতে ছন্দ আনো
নব সুরে এ পৃথিবী স্বর্গ মানো॥

*

তোমার প্রতিভা কতটুকু জানি
এসেছ নতুন ঘরে—
মনো মাঝে দেখি অম্লান দীপ
জেলেছ সবার তরে।
তুমি শুধু এসে মঙ্গল-ঘট
বসাও গৃহের মাঝে,
তব সুমধুর বাণী শুনি যেন
নিত্য প্রভাতে-সাঁঝে॥

*

প্রায়ই তব মধুর কথা
মনে পড়ে সবার আগে—
দিন-রাতে কাজের ভীড়ে
স্বপন মাঝে সদাই জাগে।
তোমার প্রীতি পেলাম বলে
আপনারে ধন্য মানি—
সেই গরবে তোমার হাতে
তুলে দিলাম মাল্যখানি॥

*

স্বপনবুড়োর ঝুলি

কমল-কোরক হঠাৎ গিয়াছে খুলি,
কচি মুখে হাসি—যেন রে ডালিম-ফুলি।
আশিস জানাই সারা মন দিয়ে আজ—
ছোট্ট এ মাথে থাকুক সোনার তাজ॥

*

রাসমণি নাম তব
রাশ টেনে বাঁচো—
নাকে মুখে তুলো গোঁজো
পাছে তুমি হাঁচো॥

*

রোজ ভোরে উঠে দেখি
রাঙা সবিতা—
মানুষের প্রাণে জাগে
নয়া কবিতা!
কাননের মাঝে ভাই
ফোটে কত ফুল
গুণ যদি থাকে কারো
নাই তার তুল॥

*

বাণীর বীণায় ছন্দ লভি
জগৎ পেলো প্রাণ
তিন ভুবনে বাজছে শুনি
তোমার মধুর তান॥

*

বসন্ত-দূত তুমি বরণ কালো
মধুর গানের স্বরে কি সুধা ঢালো !
কালো পাখী, তাই তোমা বেসেছি ভালো ॥

*

রকমারী ফুল দিয়ে তোড়াটি বাঁধা
প্রীতির পাতাটি সাথে রয়েছে গাঁথা !
বাতায়নে দোলা দিলে মৃদু সমীরণ,
তোমার কথাটি শুধু ভাবিবে যে মন ॥

শিবের মাথায় বেল পাতা দিলে
শিবের মতন বর,
পার্ব্বতি সম পতি-সোহাগিণী
আপন করিও পর ॥

*

শ্লেট আর পেন্সিলে
হল হাতে-খড়ি
ছোট খোকা অ-আ লেখে
আহা মরি মরি !

*

কচি মুখে তুলে নাও
ঘৃত-মধু-অন্ন
মানুষ হইয়া বাঁচো
তবে দেশ ধন্য ॥

*

এলো যে তোমার কুমারী জীবনে
মধুময় শুভ-লগ্ন
সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাও সে গৃহে
থাকো গৃহকাজে মগ্ন।
সকলের পায়ে প্রণত থাকিও
লভো সকলের প্রীতি
মোদের কমল নববধূ হয়ে
শোনাক নতুন গীতি ॥

*

নন্দনেরই গন্ধ মাখা একটি ফোঁটা শ্রী
তাই না পেয়ে আমরা সবাই পাগ্‌লা হবো কি ?
খল্‌খলিয়ে কেবল হাসে—
সবাই তারে দেখ্‌তে আসে—
সকল আপদ সেই ত' নাশে
চক্ষে মায়া কি ?
লক্ষীবারে পেলাম তারে—তাই লক্ষ্মী শ্রী !

*

এই সুমধুর ভোরে—
জাতীয় পতাকা পত্‌ পত্‌ করে ওড়ে !
সবাকার মাথা ছাড়িয়ে মোদের জাতীয়-পতাকা ভাই—
এর সম্মান রাখতেই হবে,—সবার উঁচুতে ঠাঁই।
তিন রঙা এই পতাকার তলে
সারি দিয়ে সবে দাঁড়া দলে দলে—
জয়ধ্বনি দে জোরে—
এই সুমধুর ভোরে—
বিশ্বের মাঝে মহান-নিশান সম্মান দেবে তোরে ॥

*

নূপুরের রুণুঝুনু শুনি
স্বশান্তের ঘুম ভেঙে যায়—
সবাকার শুভাশিস নিয়ে
বর-বধূ দাঁড়ালো ধরায় ॥

*

কুমকুম্ ! কুমকুম্ !
তোর তরে দিন রাত চোখে মোর নেই ঘুম !
চুপি চুপি গেঁথেছিনু মালা এক যত্নে
আশা ছিল গলে দিয়ে নেবো কেড়ে রত্নে !
আজিকে সানাই শুনি—তোর বিয়ে তারই ধূম !
মোর শিরে আনবিক বোমা পড়ে···বুম্ ! বুম্ !
জানা নেই, শোনা নেই কে বিশ্বরঞ্জন
একেবারে উড়ে এসে কেড়ে নিল প্রাণ-মন !
দাদু নয় কুমকুম্—ঠক্‌বার পাত্র
মিষ্টি যেন রে পাই দশ হাঁড়ি মাত্র
কনে সেজে যাস্ তুই, আমি খেয়ে দিই ঘুম ॥
কুমকুম্—কুমকুম্ !

*

প্রভাস তীর্থে শান্তির বারি
সিঞ্চনে প্রীতি জাগে—
পাখী যদি ডাকে রঙীণ ঊষায়
ফুল ফোটে অনুরাগে ॥

*

ধূপের মতন পোড়ায়েছ নিজে বিদ্যালয়ের হিতে—
দিয়েছ কেবলি শুভ-উপদেশ, দেখি নাই কিছু নিতে!
অবসর যবে আসিল তোমার—মোরা গুণগ্রাহী ভাই
তব কল্যাণ যাচি দিবানিশি আর ত' চিন্তা নাই॥

*

বই পড়ো যত খুশী
লিখো নাকো নাম,
পাতা-মোড়া বারণ যে—
তাই জানালাম।
পড়া হলে তাড়াতাড়ি
নয়া বই নাও
জ্ঞানটুকু তুলে নিয়ে
বই ফিরে দাও॥

*

এসো ভাই দেবো সবে
বিজয়ার কোল
প্রাণে যদি প্রীতি থাকে
মনে দেবে দোল॥

*

ঘোমটা দেয়া চল্‌বে নাকো
জীবন যতক্ষণ
খেলাধূলা পড়া-শোনা
এই ছিল তোর পণ!

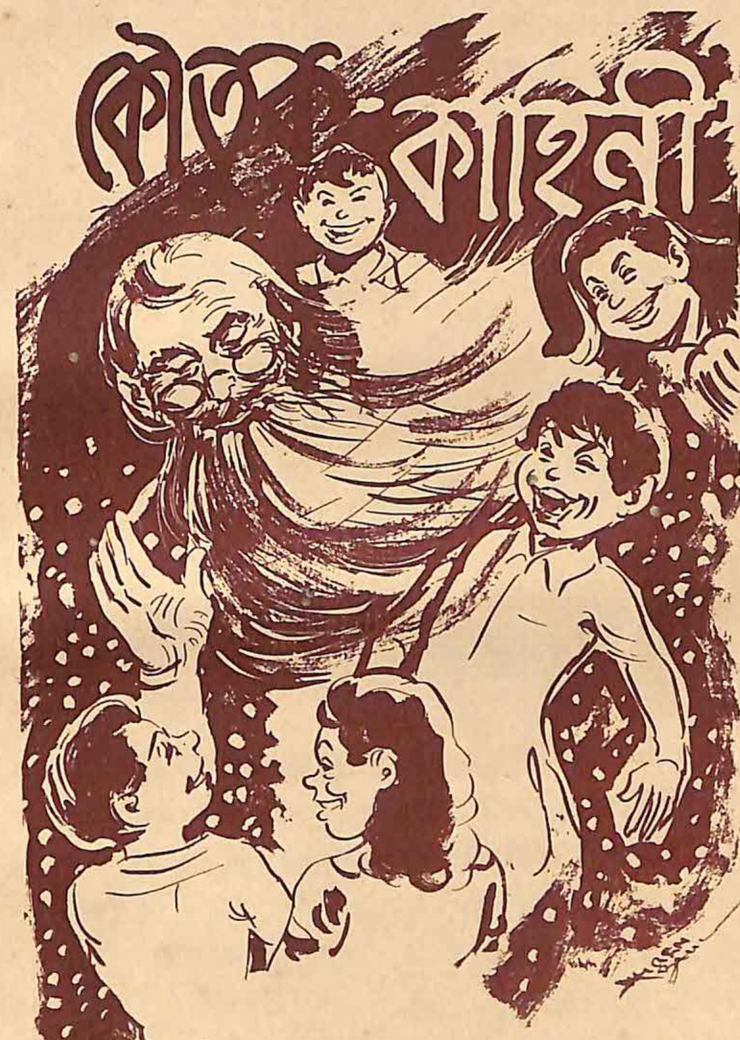
এবার দেখি রাজার কুমার
ঘোড়ায় চড়ে আসে—
উমারাণীর হাতটি ধরে
মুচ্‌কি হাসি হাসে॥

*

হাতের লেখাটি নিয়ে
কিবা হবে বল?
মনে যদি ঠাঁই নাই—
এ যে মিছে ছল!

*

শঙ্খ যদি বাজলো মনে
তবে কিসের ভয়?
চল্‌ এগিয়ে তরুণ পথিক
হবেই হবে জয়॥


কৌতুক কাহিনী

হীরের আংটি

রাজকন্যার জন্মদিন !

রাজ্যে উৎসাহের সাড়া পড়ে গেছে। ছেলেরা পাঠশালা পালিয়ে সব এসে রাজপুরীতে জড় হয়েছে !

পেটুক ব্রাহ্মণের দল ব্রাহ্মণীদের বলে দিয়েছে সাতদিন উনুনে আগুন দেয়া হবেনা।

রাজা ঘোষণা করে দিয়েছেন, সাতদিন তাঁর রাজ্যে কোন জিনিসের দাম লাগবে না—প্রজারা যার যা খুসী দোকানী-পশারীদের কাছ থেকে তুলে নিতে পারবে রাজকোষ থেকে কোষাধ্যক্ষ তার দাম মিটিয়ে দেবেন।

রাজকন্যা সখীদের সঙ্গে নৃত্য-গীতে রত ছিলেন এমন সময় অতি বৃদ্ধ রাজকবি কবিশেখরের কাছ থেকে সংবাদ এলো, রাজকুমারীর জন্মদিন উপলক্ষে তিনি এক অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করেছেন এবং রাজ কন্যাকে আহ্বান করছেন তাই পাঠ করবার জন্যে।

আনন্দে অধীর হ'য়ে রাজকন্যা সঙ্গিনীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কবিশেখরের কুঞ্জে উপস্থিত হ'লেন। তারপর কখন যে কাব্যের পুঁথিতে তন্ময় হয়ে পড়লেন তা তিনি নিজেই জানেন না। দিনের অর্দ্ধেক কেটে গেল তাঁর কাব্যের পাতার ভেতর। সখী মল্লিকা এসে জানালো—নানা দেশ থেকে উপঢৌকন আস্‌ছে তাঁর

জন্মদিন উপলক্ষে। বাধ্য হ'য়ে রাজকুমারীকে কাব্যকুঞ্জ থেকে উঠ্‌তে হল। কিন্তু কাব্যের সুমধুর আখ্যান তখনো তার মনে ভরপুর। নিজের হাতের হীরের আংটি দিয়ে যে পর্য্যন্ত তাঁর পাঠ হয়েছে সেখানে একটি চিহ্ন রেখে তাড়াতাড়ি খেয়ালী রাজকন্যা চলে এলেন মল্লিকার সঙ্গে।

তারপর উপহার ও উৎসবের মাঝখানে রাজকুমারী ভুলে গেলেন সেই কাব্যের কথা, ভুলে গেলেন কোথায় তাঁর হীরের আংটি ফেলে এসেছেন !

এই হীরের আংটি তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে রাজা নিজে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর শূন্য অঙ্গুলির দিকে দৃষ্টি পড়তেই রাজা বল্লেন, হ্যাঁরে, তোর আংটি কই ? রাজকন্যা চেয়ে দেখলেন, হাত খালি। কিছুতেই তাঁর মনে হ'ল না কোথায় আংটি ফেলে এসেছেন। রাজ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেল—রাজকুমারীর হীরের আংটি চুরি গেছে !

খোঁজ খোঁজ খোঁজ। উৎসবের আনন্দকে ডুবিয়ে দিয়ে রাজ্যে উঠল এবার আংটি খোঁজার উৎসাহ আর কোলাহল !

কিন্তু তাতেও কোনো ফল পাওয়া গেল না।

রাজা ডাক্‌লেন—মন্ত্রীকে—

মন্ত্রী ডাক্‌লেন—সেনাপতিকে—

সেনাপতি ডাকলেন—নগর রক্ষককে—

নগর রক্ষক ডাক্‌লেন—সহর কোটালকে—

সহর কোটাল ডাক্‌লেন—চৌকিদারকে—

চৌকিদার ডাক্‌লেন—পাহারাওয়ালাকে—

কিন্তু আংটির কোনো হদিশই পাওয়া গেল না! রাজার নিজের হাতে তুলে দেওয়া আংটি গেল চুরি! আর চুরি গেল কিনা রাজকন্যার জন্মদিনে।

সহর কোটাল গুম্ফেশ্বরের বড় দুর্ণামের কথা হ'ল। লজ্জায় তাঁর গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগলো। কিন্তু চুপ করে বসে থাক্‌লেই বা চলবে কি করে? গুম্ফেশ্বর তাঁর গোঁফের বোঝা নিয়ে ছুটোছুটি সুরু ক'রে দিলেন।

তাঁর উৎসাহে আর অনুসন্ধানে পাখীর দল পর্য্যন্ত গাছের ওপর বস্‌তে সাহস পায়না···কতশত পাখীর ডিম যে গাছের ওপর থেকে ভাঙা হ'ল তা' আর গুনে শেষ করা যায় না।

রাজ্যের যত পুকুরে পড়ল জাল। যত মাছ ছিল জলে, ডাঙায় উঠে এলো আর তাদের প্রত্যেকের পেট চিরে দেখা হল। পচা মাছের দুর্গন্ধে রাজ্যের লোক অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল কিন্তু হারানো আংটির কোন সন্ধানই মিললো না। একজন চৌকিদার এসে বল্লে — সহর কোটাল মশায়, মাছরাঙ্গারাও মাছ খায়··· হয়ত রাজকন্যা নদীতে স্নান করেছেন, মাছের পেটে গেছে সেই হীরের আংটি! আবার মাছরাঙ্গা খেয়েছে সেই মাছকে!

গুম্ফেশ্বর গোঁফ চুম্‌ড়ে বললেন, ঠিক! রাজ্যে যত মাছরাঙ্গা আছে সব ধর। শেষে আর মাছরাঙ্গাও পাওয়া যায় না। সহর কোটাল ঘোষণা করলেন, প্রত্যেকটি মাছরাঙ্গার জন্যে একটি করে মোহর দেয়া হবে। রাজ্যে মাছরাঙ্গার বাজার বসল কিন্তু আংটি মিলল না!

রাজা বিরক্ত হয়ে হুকুম দিলেন, কালকের মধ্যে যদি আংটি না মেলে ত' সহর কোটালের প্রাণদণ্ড হবে। শুনে ভয়ে সহর কোটালের কালো গোঁফের গোছা সাদা হ'য়ে গেল। কিন্তু তাতো গেল, প্রাণ কি করে রক্ষা পায়! সহর কোটাল সারারাত পাঁয়চারি করে বেড়াতে লাগলেন।

হঠাৎ তার মগজে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বুদ্ধি থাকলে আর ভয় কি?

সহর কোটাল রাত্রেই সেই স্বর্ণকারকে ডেকে পাঠালেন যে, রাজকন্যার হীরের আংটি তৈরী করেছিল!

সাতটা সেপাই গিয়ে তখনি স্বর্ণকারকে ধরে নিয়ে এলো। ভয়ে স্বর্ণকারেব গায়ে এলো জ্বর, সে কাঁপতে লাগলো। সহর কোটাল তাকে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, তোর কোনো ভয় নেই, তোকে আমি অনেক পুরস্কার দেবো। কিন্তু তার আগে চাই একটি হীরের আংটি যে রকম আংটি রাজকন্যার জন্যে তৈরী করেছিলি—অবিকল সেই রকম।

স্বর্ণকার সহর কোটালের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বল্লে, আমায় প্রাণে মারবেন না কর্ত্তা। গুম্ফেশ্বর আর একবার গোঁফ চুম্‌ড়ে হুমকি দিয়ে উঠে বল্লেন, ও সব ন্যাকামি রাখ্, যা বল্লাম তাই করবি কি না বল্।

স্বর্ণকার কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, কি করে করবো কর্ত্তা, সে হীরে আমি কোথায় পাবো?

গুম্ফেশ্বর ফিস্‌ফিস্ করে বল্লেন, দূর বোকা! সে হীরে তোকে দিতে হবে না, একটা নকল হীরে বসিয়ে দে—কিন্তু আংটিটি হওয়া

চাই ঠিক আগেকার মতো। রাজা কি আর অত দেখতে যাবে হীরে আসল কি নকল!

স্বর্ণকারের মুখে এবার হাসি ফুটলো। বল্ল, তা আমি করে দেবো কর্ত্তা, কিন্তু কোটাল মশাই, আমি যেন প্রাণে মারা না যাই।

গুম্ফেশ্বর আর একবার গোঁফে চাড়া দিয়ে বল্লেন, আমি রইলাম, তোর ভয় কিরে?

পরদিন স্বর্ণকার এসে গোপনে কোটালকে আংটি দিয়ে গেল। অবিকল সেই আগেকার আংটি, কে বলবে সেটা নয়।

তখন গুম্ফেশ্বর তার মগজ থেকে আর একটা বুদ্ধি বের করলেন। কেননা, আংটি পাওয়া যাবে কিন্তু কোনো চোর ধরা পড়বে না তা কেমন করে হয়? তাই তিনি চল্লেন খানাতল্লাসী করতে রাজকন্যার দাইয়ের বাড়ীতে। সেই দাই রাজকুমারীকে মানুষ ক'রেছিল।

এটা-ওটা-সেটা দেখতে দেখতে দাইয়ের বালিশের তলা থেকে বের করে ফেল্লেন সেই আংটি; তারপর প্রকাণ্ড একটা হুঙ্কার দিয়ে গোঁফে দু'বার হাত বুলিয়ে আদেশ দিলেন, বাঁধো ওই দাই বুড়ীকে। সাতশ সেপাই ছুটে এলো দাইকে বাঁধতে।

দাইয়ের তখন কি কান্না!

কিন্তু সে কান্না শোনবার সময় তখন গুম্ফেশ্বরের নেই! বিজয় গর্ব্বে তিনি গিয়ে রাজার কাছে হাজির হয়ে আংটি ফিরিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গুম্ফেশ্বর যা চেয়েছিলেন তাই পেলেন। হ'ল তার পদোন্নতি! ছিলেন কোটাল হলেন মন্ত্রী। আর সেই দাই?

রাজা তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু রাজকন্যা ওকে বড্ডো ভালোবাসতেন, তাই অনেক করে

বলতে তার হ'ল আজীবন কারাবাস। নিঃশব্দে চোখের জল মুছে প্রহরীর পিছন পিছন দাই কারাগারে চলে গেল।

এর ভেতর কেমন করে একটি বছর কেটে গেল। গেল গ্রীষ্ম, গেল বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত। আবার এলো সেই ফুল-ফুটানো বসন্ত আর সেই সঙ্গে এলো রাজকন্যার জন্ম-দিন।

রাজকন্যা আবার এলেন সেই কবিশেখরের কুঞ্জে কাব্য আলোচনা ক'রতে!

আনমনে কাব্যের পুঁথি ওল্টাতে ওল্টাতে এলেন সেই পাতে, যে পর্য্যন্ত গতবছর জন্মদিনে পড়েছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল সেই আংটি।

তারপর আর কবিশেখর পুঁথিখানি হয়ত খোলেন নি! যেমন আংটি তেমনি আছে।

তাঁর সব কথা মনে পড়ে গেল একসঙ্গে। তিনি ছুটে চলে গেলেন রাজার কাছে সেই আংটি নিয়ে, তারপর সমস্ত কিছু তাঁকে খুলে বল্লেন।

কিন্তু দুটো আংটি এলো কোথা থেকে?

রাজা গোপনে সেই স্বর্ণকারকে ডাকলেন। তাকে অভয় দিতে আসল কথা সে খুলে বল্লে। তখন সব জলের মতো পরিষ্কার হ'য়ে গেল। রাজা রাগে অগ্নি-শর্ম্মা হ'য়ে হুকুম দিলেন, মন্ত্রীকে বেঁধে আনো এক্ষুনি—

সেই সাতশ' সেপাই আবার ছুটলো মন্ত্রীর বাড়ীর দিকে। এত দিন আরামে রাজভোগ খেয়ে খেয়ে গুম্ফেশ্বরের গোঁফের পরিধি

আরো বেড়ে গেছে। সেই সাতশ সেপাই তার গোঁফ দিয়েই তাকে বেঁধে ফেল্লে।

আর সেই দাই ?

নির্জ্জন কারায় চোখের জল ফেলে-ফেলে সে হ'য়ে গেছে অন্ধ।

রাজকন্যা নিজে গিয়ে তাকে বাইরে নিয়ে এলেন। বল্লেন— দাইমা, আজ থেকে আমার চোখ দিয়ে তুমি দেখবে। আমি সর্ব্বক্ষণ তোমারি পাশে থাক্‌বো। রাজার আজ্ঞা পেয়ে সাতশ' সেপাই এক গাছের সঙ্গে গুম্ফেশ্বরের গোঁফ দিলে বেঁধে—

তোমরা যদি স্বপনবুড়োর সঙ্গে সেই রাজ্যে কখনো যাও ত' দেখবে, গুম্ফেশ্বর এখনো সেই গাছে ঝুলছে !

কোকিল-কণ্ঠ

হিসাব মেলাতে মেলাতে কলমটা ছুঁড়ে ফেলে চেয়ারটা এক-দিকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিরিঞ্চি বল্লে, এ আমার পোষাবে না, বড়বাবু—

বলে সেই যে অফিস থেকে বেরুলো, আর সেখানে ঢুক্‌লো না! ছবির পোকা'তার মাথায় বাসা বেঁধেছিলো।

খাঁড়ার মতো উঁচু লম্বা নাকটা নিয়ে সে সাত-পাঁচ ভেবে টালিগঞ্জের একটা ষ্টুডিওতে ঢুকে পড়ল।

সামনের দিকে মিস্ত্রীরা ঠকাঠক্ শব্দ করে প্রকাণ্ড 'সেট্' তৈরী কচ্ছে!

কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে সে বসবার ঘরে বসে রইল। ঘণ্টা-তিনেক পর ডিরেক্‌টারের দেখা মিল্‌ল। বিরিঞ্চির ডাক পড়লে সে তাঁকে নমস্কার করে বল্লে, আমি ভালো কমিক পার্ট করতে পারি। সেবার 'সীতার' তোত্‌লা সৈনিক সেজে এমন কেরামতি দেখিয়েছিলাম যে, গ্রামের জমিদার-গিন্নি হাসতে হাসতে 'ফিট্' হয়ে পড়েছিলেন। শেষে শশী ডাক্তার এসে—

ডিরেক্‌টার তাকে থামিয়ে দিয়ে, বল্লে, আচ্ছা. আচ্ছা,—সম্প্রতি আমাদের একখানা বই তোলা হচ্ছে—তাতে একটা কমিক-পার্ট আছে, কিন্তু আপনি কি গান জানেন···?

বিরিঞ্চি মাথা চুল্‌কে বল্লে, আজ্ঞে হ'য়ে যাবে 'খন।—' ছেলেবেলায়—"আজি এসেছি—এসেছি" গানখানা খুব ভালো গাইতে পারতুম—তা চেষ্টা করলে এখনো—

ডিরেক্‌টার বল্লেন, বেশ, সাতদিন পর আসবেন। আপনার 'ভয়েস' 'টেষ্ট' করা হবে।

বিরিঞ্চি নমস্কার জানিয়ে মেসে ফিরে এলো। এলো বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ থেকে ঘুম একেবারে ছুটি নিলে!

কি করে সাতদিনের ভেতর সে গান শিখবে? চুপি চুপি সে 'সিঙ্গল্‌ রিডের' একটী হারমোনিয়ম কিনে নিয়ে এলো।

সন্ধ্যার মুখে সবাই এদিক-ওদিক বেরিয়ে গেছে—বিরিঞ্চি ছাদের ওপরকার চিলে কুঠুরিতে বসে আপন মনে গান গাইতে স্থরু করে দিলে।

গান সে প্রাণ খুলেই গাইলে, কিন্তু বিপদ ঘট্‌ল পরদিন সকাল বেলা।

ঘুম থেকে উঠে সবে ভোলাকে এক কাপ চা আনতে হুকুম দিয়েছে, এমন সময় ম্যানেজার হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এসে বল্লে, মশাই, কাল সারারাত আপনার চীৎকারে পাশের বাড়ীর লোকরা ঘুমুতে পারেনি। তারপর একটু দম নিয়ে কথাটা শেষ করলে, আজ বিশ বছর মেস চালাচ্ছি মশাই, কিন্তু আমার বোর্ডারদের এমন বদনাম কেউ দিতে পারে নি। এসব আমার এখানে চলবে না—এ সোজা কথা।

চাকরি ছিল না বলে—বিরিঞ্চির এক মাসের ফুডিং-চার্জ্জ বাকি

ছিল। কাজেই ম্যানেজার আগে থেকেই তার ওপর খাপ্পা হয়েছিল—এইবার সে বিষ-দাঁত ফুটিয়ে দিতে একটুকু কসুর করলে না!

বিরিঞ্চি দেখলে সঙ্গীত-চর্চ্চায় এখানে মহাবিঘ্ন। স্থির করে ফেল্লে, দেশে ফিরে নির্জ্জনে একান্তে বসে সাতদিন সে সাধনা করবে—তারপর ডিরেক্টারের কাছে হবে তার পরীক্ষা।

সেই রাত্তিরেই সে দেশে পোঁছে গেল।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে—গলা সপ্তমে চড়িয়ে দিয়ে সে সুরু করলে—সা—রে—গা—মা—

পাশের ঘরে বিরিঞ্চির বড়দা ওকালতির নথিপত্র দেখছিলেন, লাফিয়ে উঠে বল্লেন, আ—মোলো যা! চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলি—বেশ! বাড়ী বসে—খা-দা-থাক। তা নয় এসেই ষাঁড়ের মতো চ্যাচাতে সুরু করে দিলে!

বিরিঞ্চি দেখলে এখানে সুবিধে হবেনা। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে বাড়ীর পেছন দিককার ছোট্ট একটি অন্ধকার ঘর বেছে নিলে এবং সন্ধ্যে সুরু না হতেই হারমোনিয়মটা লুকিয়ে নিয়ে সেইখানে সঙ্গীত-চর্চ্চা সুরু করে দিলে।

কতক্ষণ নির্বিঘ্নে তার সাধনা চলেছিল বলা মুস্কিল, কেন না খানিকবাদেই দরজার বাইরে ঠাকুরমার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

ঠাকুরমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠে বল্লে, অ—বিরিঞ্চি, আমাকে কি মালা জপতেও দিবি নে?

দাওয়ায় বসে দিব্যি হরিনাম কচ্ছিলুম—তা কি রকম ষাঁড়ের মতো চ্যাচাচ্ছে দেখো না—!

নাঃ—বাড়ীতেও সাধনার অনেক বিঘ্ন। পরদিন ভোর হবার অনেক আগে, অন্ধকার থাকতে থাকতে বিরিঞ্চি হারমোনিয়মটা বগলদাবা করে বাড়ীর পাশের জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল।

তারপর অবাধে এবং অব্যাহত গতিতে চল্লো তার সঙ্গীত-চর্চ্চা। বেশ মন খুলে বিরিঞ্চি গান গেয়ে চলেছে—কিছুর মধ্যে কিছু না—হঠাৎ পিঠের ওপর দমাদ্দম লাঠি আর সঙ্গে সঙ্গে রমণী ধোপার গলা শুনতে পাওয়া গেল।

—কাল দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে সমস্তটা রাত ঘুমুতে দিস্‌নি—আজ আবার সক্কালবেলা জঙ্গলে ঢুকে চ্যাচানো হচ্ছে!

বলেই আবার দমাদ্দম পিঠে লাঠি!

বিরিঞ্চি প্রথমটা ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়েছিল—তারপর লাফিয়ে উঠে বল্লে, ওরে রমণী, আমি রে আমি। বিরিঞ্চিকে ঐ ভাবে দেখে রমণী ধোপা প্রকাণ্ড একটা জিব বের করে ফেল্লে।

—সে কি দাদাবাবু! তুমি শেষ রাত্তিরে জঙ্গলে ঢুকে চ্যাচাচ্ছ কেন? আমি মনে করলুম—আমার সেই হারাণো—

বলেই আবার জিবে কামড়। তারপর বিরিঞ্চির পা দুটো জড়িয়ে ধরে বল্লে, একথা---কাউকে বোলো না দাদাবাবু, তাহলে কর্ত্তাবাবু আর আমার পিঠে চামড়া রাখবে না।

বিরিঞ্চি আর প্রকাশ করবে কি? কথাটা জানাজানি হলে তার কি মুখ দেখাবার যো থাকবে? বল্লে, যা, যা, আমি কাউকে বলব না—তুই এখন পালা—

তাকে—সমস্তটা দিন চুপচাপ বসে থাকতে দেখে—পাড়ার দাশুখুড়ো কইলে, কি হে ভায়া, কলকাতা থেকে এসে এমন মন-মরা হয়ে আছ কেন? আজব সহরের নতুন গল্প-টল্প শোনাও।

বিরিঞ্চি তাকে সব কথা খুলে বলে শুধোলো, আচ্ছা, গানটা কি করে শিখি বল ত?

খুড়ো রসিক লোক, বল্লে, এ আর জানো না ভায়া? লক্ষ্ণৌ দিল্লীর সব বড় বড় ওস্তাদরা কি খেয়ে গলাকে এমন মিষ্টি করে?

বিরিঞ্চি উৎসাহিত হয়ে বল্লো, বল না দাদা, বল না, সত্যি বলছি—আমার গান ছবিতে উঠ্‌লে তোমায় ফার্ষ্ট ক্লাশের পাশ পাঠিয়ে দেবো।

খুড়ো—গলা খাটো করে মুখটা তার কানের কাছে নিয়ে এসে কইলে, চুপি চুপি একটা কোকিল ভাজা খেয়ে ফেল দেখি কেমন গলা না মিষ্টি হয়?

বিরিঞ্চি ভাবলে, তাইত? নিশ্চয় ওরা কোকিল ভাজা খায়! নইলে কোকিলের মত গায় কি করে?

বিরিঞ্চি তখন ঠিক করলে, বেশ ভাল গাওয়া ঘিয়ে কোকিল ভেজে খেতে হবে। তার জন্যে বেশী দূর যেতেও হ'ল না। বাড়ীর গুপী ঠাকুর বহুদিন থেকে একটা কোকিল পুষতো।

সে চুপি চুপি গিয়ে বাড়ীর চাকর জনার্দ্দনের শরণাপন্ন হ'ল —এবং সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলে, যদি সে কাউকে না জানিয়ে ঐ

কোকিলটা ভেজে খাওয়াতে পারে ত তাকে সে এক টাকা বকশিস্ দেবে।

কোকিলটার উপর জনার্দ্দনের অনেকদিন থেকে রাগ! সে যখন কাজ কর্ম্ম সেরে দুপুর বেলা একটু গড়ায় কোকিলটা তখন কুহু-কুহু করে কান ঝালাপালা করে তোলে!

কিন্তু গুপী ঠাকুর কর্ত্তার পেয়ারের বামুন, তাঁর ভয়ে কিছু বল্‌তেও সাহস করে না।

এই সুযোগে যদি এক সঙ্গে শত্রু-নিপাত এবং একটাকা বক্‌শিস্ লাভ হয় ত মন্দ কি?

জনার্দ্দন এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল। তারপর রাত্তিরের অন্ধকারে সবাই ঘুমুলে কোকিলটাকে খাঁচা থেকে বের করে দিব্যি ভালো গাওয়া ঘিয়ে ভেজে ফেলে বিরিঞ্চিকে ডেকে তুলে বল্লে, গরম-গরম খেয়ে ফেল দাদাবাবু।

আমি এই ফাঁকে দেখে আসি গুপীঠাকুরটা কি করছে।

বিরিঞ্চিকে তখন পায় কে! সে স্বপ্ন দেখ্‌ছে, ছবির পর্দ্দায় তার কোকিল-কণ্ঠের গান শুনে কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীর দল ঘন ঘন করতালি দিচ্ছে।

কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হ'ল না, পরদিন সকাল থেকে সুরু হ'ল বিরিঞ্চির ঘন ঘন দাস্ত আর বমি।

তারপর কি করে সমস্ত ঘটনাটা প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং পাড়ার ছেলের দল বিরিঞ্চির নামকরণ করলে 'কোকিল-কণ্ঠ'। সে কথা এদ্দিন বাদে আমার মুখ দিয়ে প্রকাশ হলে বিরিঞ্চি আমার আর মুখদর্শন করবে না!

স্বপনবুড়োর ঝুলি

দুষ্ট লোকে বলে থাকে, আমিই নাকি জনার্দ্দনের মুখ থেকে সত্যি কথাটা বের করে নিয়েছিলাম।

আমি সে কথার তীব্র প্রতিবাদ করি, অবিশ্যি বিরিঞ্চির সামনে। কিন্তু বিরিঞ্চির বন্ধুত্ব হারাতে আমি আদপেই রাজী নই কাজেই এখানেই ইতি।

॥ স্বপনবুড়োর মজার বই ॥

উপন্যাস—বেপরোয়া, বন-পলাশীর ক্ষুদে ডাকাত, বাস্তুহারা, পঙ্ক থেকে পদ্ম জাগে, ধন্যি ছেলে, শশী শ্যামলের সাঁকো, উড়ন্ত চাকি, প্রেতপুরী, নরহরি পণ্ডিতের কাহিনী (যন্ত্রস্থ)

গল্প—ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প, স্বপনবুড়োর গল্প সঞ্চয়ন, স্বপনবুড়োর হাসির গল্প, স্বপনবুড়োর মজার গল্প, স্বপনবুড়োর রকমারী গল্প, স্বপন বুড়োর স্বনির্ব্বাচিত গল্প প্রভৃতি

নাটক—বাণী, কমলা, ছেলেদের একাঙ্কিকা, এশিয়ার নৃত্যছন্দ, স্বপনবুড়োর শিশুনাট্য (দুই ভাগ) আত্মহত্যা, প্রতিশোধ, মায়াপুরী, তালবেতাল, প্রথম পুরস্কার, বাপ্পাদিত্য, মহাপূজা প্রভৃতি

ভ্রমণ কাহিনী—সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে, দেশে দেশে মোর ঘর আছে

হাসির কবিতা—স্বপনবুড়োর হুল্লোড়

হাসির গল্প—এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা (বড়দের)

সঙ্কলন—স্বপনবুড়োর ঝুলি, পালা-পার্ব্বণ ছড়-ছন্দ, ছোটদের মধুচক্র ইত্যাদি

ছড়া—স্বপনবুড়োর ছড়া

জীবনী—স্বপনবুড়োর শৈশব

খুব ছোটদের—পড়াশোনা